উন্মেষ

২০২২-২৩

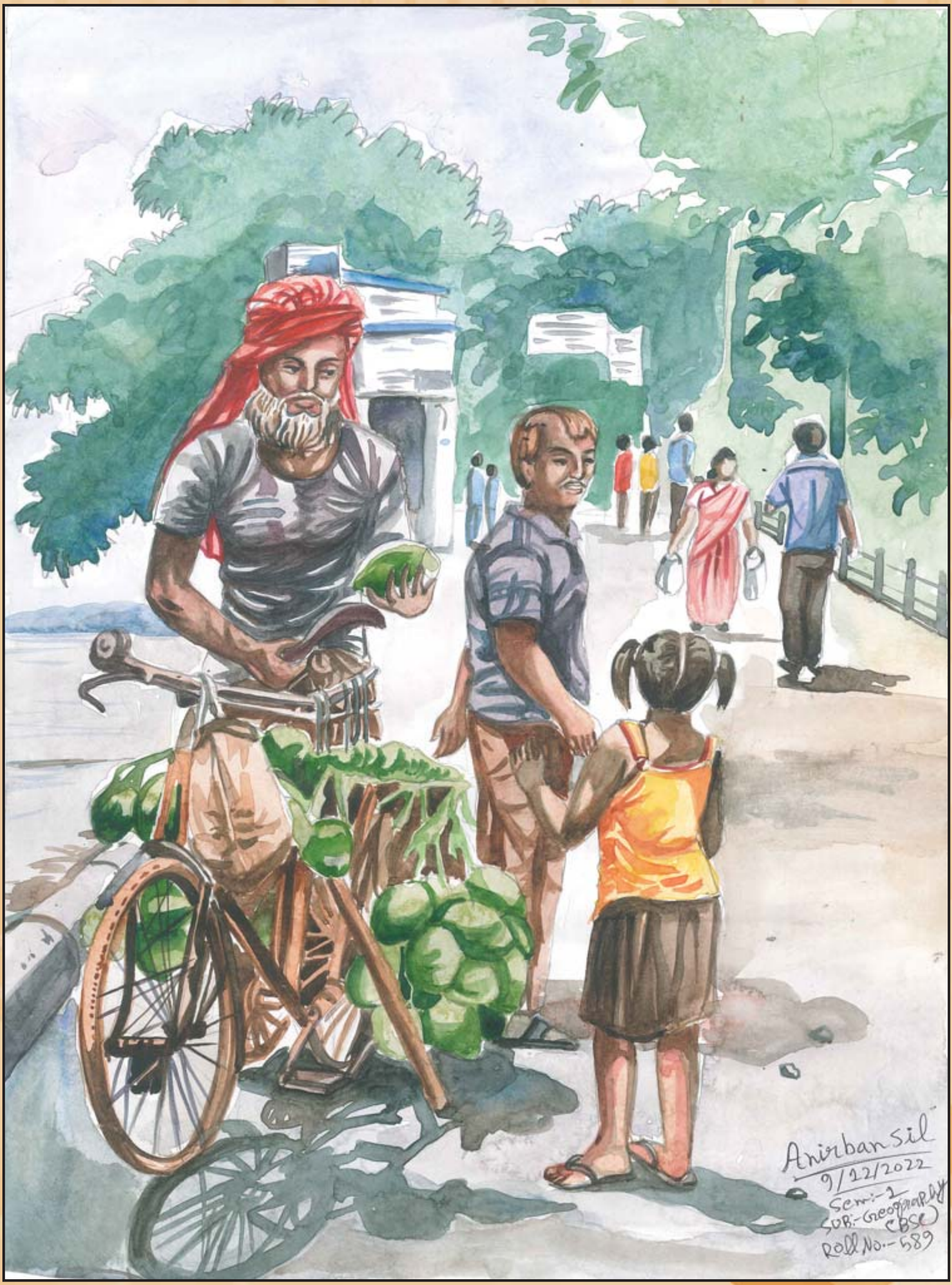

প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশ মহাবিদ্যালয়

বনহুগলী, কলকাতা

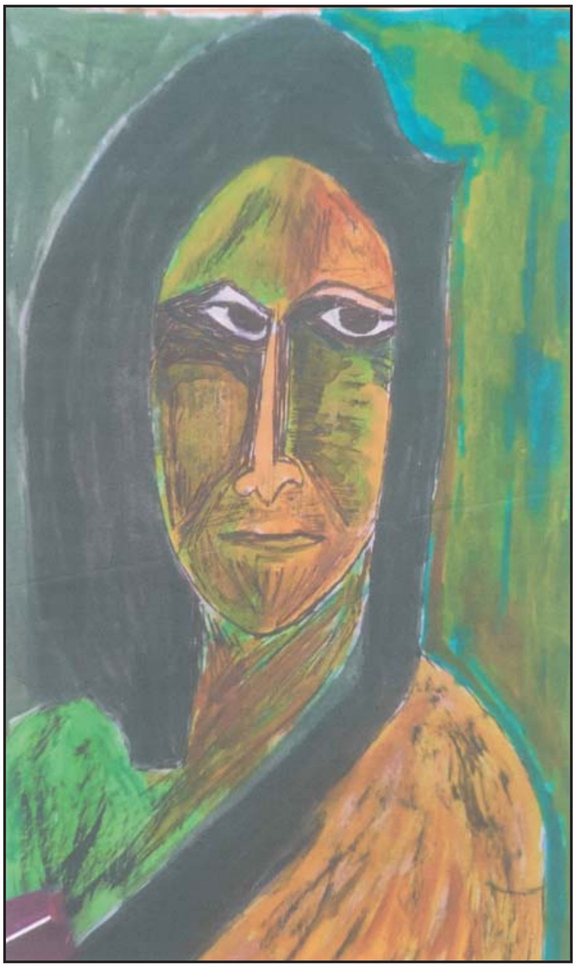

শর্মিষ্ঠা মিত্র (শিক্ষিকা, দর্শন বিভাগ)

মনিষা রবিদাস (ফুড এন্ড নিউট্রিশন অনার্স, সেমিস্টার-৩, রোল-৬৫৮)

উন্মেষ

২০২২-২৩

Title : UNMESH

Editor in Chief : Dr. Arnab Ghosh

General Editor : Sudarsana Sarkar

Date of publication : 2nd June 2023

ISBN NO : 978-81-957244-4-4

Published by : Ratna Roy, Hornbill Books

Publishers address: 53/3 Jadav Ghosh Road (Ground Floor)
Sarsuna, Kolkata- 700061
Contact: 9883113034
email: hornbillboos2022@gmail.com

Copyright © : Dr. Arnab Ghosh

copyright : All rights reserved. No part of the site may be reproduced or copied in any form or by any means [graphic, electronic or mechanical, including photocopying, recording, taping or information retrieval systems] or reproduced on any disc, tape, perforated media or other information storage device, etc., without the explicit written permission of the editor. Breach of the condition is liable for legal action. However, the permission to reproduce this material does not extend to any material on this site, which is explicitly identified as being the copyright of a third party. Authorization to reproduce such material must be obtained from the copyright holders concerned.

Printers address : Modern Printers, Kolkata:700090

HORNBILL BOOKS

BOARD OF EDITORS

Editor-in-chief

Dr. Arnab Ghosh, Principal

General Editor

Sudarsana Sarkar

Assistant Professor, Department of Economics

Members of Editorial Board
(Members of Magazine Subcommittee)

1. **Sudarsana Sarkar (Convener)**
   Assistant Professor, Department of Economics

2. **Arka De Barman**
   SACT, Department of English

3. **Chandrama Basu**
   SACT, Department of English

4. **Uttara Kundu Choudhuri**
   SACT, Department of Bengali

5. **Nibedita Tarafdar**
   SACT, Department of Bengali

6. **Priyadarshini Chakraborty**
   SACT, Department of Food and Nutrition

7. **Mousumi Bose**
   SACT, Department of Bengali

সভাপতির বার্তা

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের মৌলিক চিন্তা-ভাবনা ও সৃজনশীলতার উজ্জ্বল প্রকাশ 'উন্মেষ' পত্রিকা। জন্মলগ্ন থেকেই এই মহাবিদ্যালয় প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সমান্তরাল স্বাধীন চিন্তন ও মননের বিকাশক অনুকূল পরিবেশ তৈরীতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ — তারই বহিঃপ্রকাশক এই পত্রিকা। আগামী দিনে এই পত্রিকার উৎকর্ষতা বৃদ্ধি ও মানোন্নয়নের কামনায় সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

সভাপতি, পরিচালন সমিতি
প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ মহাবিদ্যালয়
ও
বিধায়ক, বরানগর বিধানসভা
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

অধ্যক্ষের কলমে...

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ মহাবিদ্যালয়ের বার্ষিক পত্রিকা উন্মেষের 'অধ্যক্ষের কলমে' প্রথমবারের জন্য লিখতে বসে আমার মনে হল যে কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এই ধরণের পত্রিকা প্রকাশের গুরুত্ব কতটা তা একবার ঝালিয়ে নেওয়া আবশ্যক। আজকাল বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে এ-ধরনের পত্রিকা প্রকাশের প্রবণতা কম আসছে — আবার যদিবা প্রকাশ হচ্ছে তা অতিরিক্ত মাত্রায় তথ্যের ভারে ন্যুব্জ। তথ্যের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই আছে। কিন্তু, আমাদের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা তো এমনিতেই তথ্যকেন্দ্রিক। কিন্তু শিক্ষার মূল লক্ষ্য হল জ্ঞানার্জন। জ্ঞানের লক্ষণ প্রকাশিত হয় শিক্ষার আত্তীকরণে অর্থাৎ, স্বামীজির ভাষায় 'assimilation of knowledge'। শিক্ষার আত্তীকরণ সম্পন্ন হলে তার লক্ষণ প্রকটিত হয় স্বাধীন যুক্তি-নির্ভর মৌলিক চিন্তা-ভাবনার মধ্যে। স্বাধীন চিন্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে মৌলিক সৃজনশীলতার মধ্যে — সাহিত্য ও শিল্পকলা সৃষ্টির মাধ্যমে। অর্থাৎ, মূল কথা হল শিক্ষার যথার্থ মূল্যায়ণ ঘটে মৌলিক সৃষ্টির মধ্যে. কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের প্রচলিত মূল্যায়ণ পদ্ধতিতে স্মৃতিশক্তির পরীক্ষা হয় — সৃজনশীলতা প্রমাণের সুযোগ খুবই অপ্রতুল। এই সীমাবদ্ধতাকে আংশিক পূর্ণতা দেওয়ার সুযোগ হয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দেওয়াল-পত্রিকা, বার্ষিক পত্রিকা প্রকাশ ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে। অর্থাৎ, বোঝা গেল যে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মানের প্রকৃত মূল্যায়ণ ঘটে সৃষ্টিশীল কার্যকলাপের মধ্যে যার অন্যতম হল উৎকৃষ্ট গুণমানসম্পন্ন বার্ষিক পত্রিকা প্রকাশ। এই চেতনা থেকেই আমাদের মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষাকর্মীরা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে এই কাজে ব্রতী হয়েছেন। তাদের এই আন্তরিক প্রচেষ্টাকে ত্বরান্বিত করতে মহাবিদ্যালয়ের পরিচালন-সমিতির মাননীয় সদস্য/সদস্যারাও তাঁদের মৌলিক সৃষ্টির কিছু অংশ আমাদের সাথে ভাগ করে নিয়ে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন যা ব্যতিক্রমী ভূমিকার দাবি রাখে। 'উন্মেষ' অদূর ভবিষ্যতে এই মহাবিদ্যালয়ের 'মুখ' হয়ে উঠবে এই কামনাই করি। সবশেষে স্বামীজীর ভাষায় বলি, ''Nervous Association দরকার। আমার শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে এই যে আমার প্রত্যেক স্নায়ুতন্ত্র পর্যন্ত ঐ চিন্তা, ঐ তত্ত্ব, ঐ জ্ঞান যা আমি শিখেছি সেই সুরে বাঁধা থাকবে। আমি যে তত্ত্ব, যে সত্য শিখেছি সেগুলো আমার রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে থাকবে, শুধু মুখে নয়।" তারই মধ্যে দিয়ে হোক আমাদের স্বাধীন, স্বকীয় মননের উন্মেষ।

ড: অর্ণব ঘোষ

অধ্যক্ষ

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ মহাবিদ্যালয়

‘উন্মেষ’

‘উন্মেষ’ হল আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা দ্বারা প্রকাশিত কলেজ পত্রিকা। প্রতিবছর ‘উন্মেষ’ এর প্রকাশন হয়। ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক-শিক্ষিকারা তাদের রচিত গল্প, কবিতা, ভ্রমণ কাহিনী এই ‘উন্মেষের’ মাধ্যমে তুলে ধরে। এবার এই ‘উন্মেষ’ পত্রিকার দ্বিতীয় সংস্করণ। এই পত্রিকার মধ্য দিয়ে আমরা চেষ্টা করি আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে যাতে এক সূত্রে বেঁধে থাকতে পারি। ‘উন্মেষে’ আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের লেখা, গল্প, কবিতার সব দিয়েছে — যেটা পড়ে পাঠকরা আনন্দ পাবে ও তাদেরকে আরো উৎসাহিত করবে যাতে তারা আগামীদিনে এগিয়ে যেতে পারে। ‘উন্মেষ’ আরো বড় হোক — এই প্রার্থনা করি।

ড. আলপনা রায়
IQAC, Coordinator

মুখবন্ধ

‘উন্মেষ’ আমাদের মহাবিদ্যালয়ের বার্ষিক পত্রিকা। এ পত্রিকা একদিকে যেমন এই মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ করে দিয়েছে, তেমনি আমার কিছু বক্তব্যকেও ব্যক্ত করার সুযোগ করে দিয়েছে, এর জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।

পৃথিবী যখন হিংসায় উন্মত্ত, মানুষ যখন স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রিকতা, ঈর্ষা, ভোগবিলাস, দাদাগিরি ইত্যাদিকে জীবনের সারকথা বলে বিশ্বাস করে নিয়েছে, তখন প্রকৃতি মানবজাতিকে বুঝিয়ে দিচ্ছে রাষ্ট্রের সবাইকে বাদ দিয়ে একা বাঁচা যায়না। অনেকগুলি রাষ্ট্রের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে এই পৃথিবী। পৃথিবীর ভারসাম্য বজায় রাখতে গেলে পরিবেশ দূষণকে সরিয়ে রেখে মানুষকে অবশ্যই পরিবেশ প্রকৃতিকে দূষণমুক্ত করতে হবে।

করোনা মহামারী বুঝিয়ে দিচ্ছে যে, আমরা ভালো থাকতে চাইলেও এই মহামারী কোন সীমারেখা মানবে না, ধনী দরিদ্র মানবে না, সবার উপর দিয়ে প্রভাবিত হবে ধ্বংসাত্মক রুপ নিয়ে।

এই সংকট কাটতে না কাটতেই শুরু হয়ে গেল রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ। ফলস্বরূপ পরিবেশ দূষণ। অসংখ্য প্রাণহানি, জীবাশ্ম জ্বালানি সঙ্কট, খাদ্য সঙ্কট। করোনা, তারপর রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, তার ফলস্বরূপ অসংখ্য মৃত্যু, মানুষের দুর্ভোগ, অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, খাদ্য সঙ্কট দেখা দিল সমগ্র বিশ্বে। যুদ্ধের আতঙ্কে হাজার হাজার মানুষের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়েছে। চারিদিকে শুধু মানুষের চিৎকার ও আর্তনাদ। খাবারের জোগারের শৃঙ্খলে প্রায় বিশ কোটি মানুষ দুবেলা পেট পুরে খেতে পাচ্ছেন না।

এর মধ্যে আশার আলো, দেখা দিচ্ছে, কারণ মিশরে পরিবেশ নিয়ে আন্তর্জাতিক বিশ্ব সম্মেলন বসেছিল। দুনিয়ার সব রাষ্ট্র এক ছাতার তলায় সামিল হয়েছিল পরিবেশকে বাঁচানোর জন্য, এটা ভালো লক্ষণ। তার জন্য গ্লাসগো তে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে পরিবেশ দূষণ কমানোর জন্য কয়লাকে কম ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে জীবাশ্ম জ্বালানী ব্যবহারের ছক পুরো ঘটনাকে বদলে দেয়। চরম মনকষা-কষি চলে। ফলে জ্বালানী সংকট মেটাতে আবার কয়লার ব্যবহার ফিরে আসে। প্রশ্ন এখানেই যখন অস্তিত্বের সঙ্কট, তখন আমরা কতটা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ?

পৃথিবীর তাপমাত্রা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে পরিবেশ দূষণের জন্য। পর্বতের চূড়ার বরফ গলছে, পৃথিবীর জলস্তরের উচ্চতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেজন্য সমগ্র বিশ্বে পরিবেশ সচেতনতামূলক বিষয় হিসাবে পৃথিবীর তাপমাত্রা কমাবার প্রচেস্টা চলছে। কিন্তু তাপমাত্রা কম করলেই পরিবেশ শান্ত হবে কিনা সেটা সময়ই বলবে। এখন পৃথিবীর জনসংখ্যা প্রায় ৮০০ কোটিতে ঠেকেছে সেখানে একটি বড় অংশ ১৩৮ কোটি মানুষ ভারতবর্ষের মত দেশে বসবাস করছে। বর্তমান প্রযুক্তি সমৃদ্ধ আধুনিক যুগে উন্নয়ন থামিয়ে রাখার ক্ষমতা কারও নেই। অথচ বেঁচে থাকার রসদ জোগায় প্রকৃতি। কিন্তু এই প্রকৃতির ভারসাম্য আদতে

আমরা বজায় রাখতে পারব কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এর ফলে সমগ্র বিশ্বের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। প্রযুক্তি ও আবিষ্কারের জেরে দুনিয়ার এক অংশ বেলাগাম উন্নতি করেছে। তারা নির্বিচারে এগিয়ে গিয়ে পিছিয়ে পড়া দেশগুলোর জন্য একটা উন্নয়নের লক্ষ্য রেখে দিচ্ছে। সেই উন্নয়নকে সফল রূপ দিতে চারপাশে বড় বড় গাছ কেটে নতুন নতুন লোকালয় গড়ে উঠেছে। আধুনিক শহর নির্মান করছে মানুষ। ফলে বনজ সম্পদের এক বড় অংশ ধ্বংস হয়ে গড়ে উঠছে ইট-কাঠ-প্রস্তর নির্মিত ইমারত। ফলে একদিকে যেমন বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমে মরুভূমি সমপরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভবনা দেখা দিচ্ছে, তেমনি বৃষ্টির অভাবে ফসল উৎপাদনও কম হচ্ছে। এর ফলে কৃষিজ উৎপাদন কম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক ভারসাম্যও নষ্ট হচ্ছে। আবার পরিবেশ দূষণের ফলস্বরূপ রোগ ব্যাধি দ্বারা মানুষ আক্রান্ত হওয়ার ফলে স্কুল কলেজ, অফিস, আদালতে, কর্মীর অনুপস্থিতির সংখ্যা যেমন বাড়ছে, তেমনি কৃষিক্ষেত্রেও শিল্পক্ষেত্রে শ্রমিকের সংখ্যাও কমছে। ফলে কৃষি ও শিল্প উৎপাদন ব্যহত হচ্ছে এবং বিশ্বের অর্থনীতি ও বিপর্যস্ত হচ্ছে। আবার অন্যদিকে অনুন্নত দেশগুলো, উন্নত দেশের ঝাঁ চকচকে মসৃণ জীবন দেখে অনুকরণ করে সেই পথেই হাঁটছে। অথচ সেই দেশগুলোর পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদ নেই কিন্তু উন্নত দেশের মতো জীবন চাই। সেই লক্ষ্যে প্রাকৃতিক সম্পদের চরম অবনমন চলছে। সেখানে বর্তমানে রাশিয়া-ইউক্রেনের যুদ্ধ তাতে অতিরিক্ত মাত্রা এনে দিয়েছে। যদিও ইউক্রেন সারা দুনিয়ার মাত্র তিন শতাংশ খাবার জোগান দেয়, তবুও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে সমস্ত পৃথিবী ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। বহু সংখ্যক মানুষের যেমন মৃত্যু ঘটছে, তেমনি মূল্যবৃদ্ধিও চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে।

মেরুর বরফ গলা বা জলস্তর বৃদ্ধি কমানোর প্রযুক্তি মানুষের বুদ্ধির উপর নির্ভরশীল, মানুষের এই উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগ সত্ত্বেও ভবিষ্যতে মালদ্বীপ, ওশিয়ানিয়া এমনকি কলকাতা-মুম্বাইও রয়েছে জলে নিমজ্জিতের তালিকায়। মজার কথা, সবকিছুর লক্ষ্য যখন বায়ু ও তাপমাত্রা দূষণ বিষয়ে, তখন জল ও মাটির দূষণের বিষয়ে খুব কম চিন্তা ভাবনাই করেছেন রাষ্ট্রনেতারা। কেননা প্রতি বছর কয়েক লক্ষ্য হেক্টর জমি দূষণের কারণে চাষ অযোগ্য হয়ে উঠেছে, একথা আমাদের অবহেলা করলে চলবে না। সমস্যা ঘনীভূত হচ্ছে, দুটো কারনে এক, উন্নয়নের রথ ছোটানো, দুই সাতশো কোটিরও বেশী মানুষকে উপযুক্ত মানে বাঁচিয়ে রাখা। কাজেই এর প্রভাব কি হবে, তা বলা মুশকিল। যেমন বনজ সামগ্রীর ব্যবহার কমাতে এককালে প্লাস্টিকের বর্ধিত ব্যবহারের ফলে পরিত্যক্ত প্লাস্টিক, জল ও মাটিদূষণ ক্রমশ বাড়িয়ে চলেছে। অর্থাৎ নতুন প্রযুক্তি নতুন কোনও বিপদ ডেকে আনছে কিনা তা অজানা। শহরে শপিংমল, বহুতল বাড়ি গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ভূমিজ জলের স্তর নেমে যাচ্ছে। প্রতিঘরে এখন বাতানুকুল এসি যন্ত্র। শহরের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামেও বেশ কিছু ধনী, অর্থসম্পন্ন গৃহে একই চিত্র দেখা যাচ্ছে, ফলে প্রকৃতির সঙ্গে আজ আমাদের নিবিড় সংযোগ হারিয়ে যাচ্ছে। সকালে সবুজ ঘাস ঢাকা মাঠে হাঁটার পরিবর্তে মানুষ কৃত্রিম আধুনিক গাড়ি চড়ছে। পূর্বের মত বট, অশ্বত্থ গাছের নীচে প্রকৃতির মুক্ত বাতাসে বিশ্রাম নেওয়ার পরিবর্তে ঘরের কৃত্রিম আলোয় বাতানুকুল এসি যন্ত্র চালিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে। চারপাশে কম্পিউটার, মোবাইল, আধুনিক যন্ত্রের ব্যবহার বেড়ে চলেছে। উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালাতে চালাতে মানুষ নিজের অজান্তেই পরিবেশ অনবরত দূষিত করে চলেছে। ফলে মানুষ জাতির অস্তিত্ব আজ বিপন্ন হয়ে পড়েছে। পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে প্রখর সূর্যালোকের কারনে বর্তমানে সানস্টোকের সংখ্যাও বাড়ছে। খাদ্যে

বিষাক্ত অতিরিক্ত রাসায়নিক সার, কীটনাশক ও রং করার দ্রব্যাদি মেশানোর ফলে মানুষের হঠাৎ মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে, যার শিকার হচ্ছে শিশু, বৃদ্ধ, যুবক সহ সব ধরণের বয়সের মানুষ। যদিও চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি হয়েছে, তবুও দুরারোগ্য নতুন ব্যাধির সংখ্যা বাড়ছে যা মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে, করোনা মহামারী সেটাই প্রমাণ করে দিয়েছে। এই মহামারীর কারনে মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়ায় মানুষের দারিদ্রতা বেড়েছে। সেই সঙ্গে প্রচুর মৃত্যু ও ঘটেছে। এই প্রভাব কমতে না কমতেই শুরু হয়ে গেছে রাশিয়া-ইউক্রেনের যুদ্ধ যা সমগ্র রাষ্ট্র তথা বিশ্বের কাছে একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে কিভাবে এর প্রভাব থেকে মানবজাতির অস্তিত্বকে রক্ষা করা যায়।

এরকম প্রতিকূল পরিস্থিতিতে এসে সৃষ্টিমূলক চিন্তা করা খুব কঠিন বিষয়। মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক, অধ্যাপিকারা তাঁদের সৃজনশীলতা দিয়ে ছাত্র ছাত্রীদের প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করেছেন। আমরা সেই মাননীয় শিক্ষক শিক্ষিকাদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। মহাবিদ্যালয়ের কর্ণধার আমাদের মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়কে জানাই আমাদের কৃতজ্ঞতা। তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ এবং ম্যাগাজিন কমিটির ওপর বিশ্বাস ও ভরসা আমাদের পথ চলাকে অনেক সুগম করেছে। এই পত্রিকা প্রকাশ কোনো এক ব্যক্তি বা শুধু একটি কমিটির কাজ নয়, অনেক মানুষ বিভিন্নভাবে আমাদের সাহায্য করেছেন। আমরা এই মহাবিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষা কর্মী সকলের কাছে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা পেয়েছি। ম্যাগাজিন কমিটির পক্ষ থেকে তাঁদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, আর প্রত্যাশা রাখছি একইভাবে এই কমিটির অকৃপণ সহযোগিতা ভবিষ্যতেও পাবো।

পরিশেষে জানাই এই পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ার জন্য যে সমস্ত ব্যক্তি বিভিন্নভাবে আমাদের সাহায্য করেছেন এবং সেই সঙ্গে আমাদের মহাবিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষা-কর্মীদের কাছ থেকে যে সহযোগিতা পেয়েছি, তাতে আমরা ম্যাগাজিন কমিটি এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে ভীষণ উৎসাহিত, আপ্লুত। ভুল ত্রুটি যা রয়ে গেছে তা একান্তভাবেই অনিচ্ছাকৃত।

সুদর্শনা সরকার
আহ্বায়ক
ম্যাগাজিন কমিটি
প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ মহাবিদ্যালয়
বনহুগলী, কলকাতা

STUDENTS' UNION

A Glorious Part of College

The overall progress and development of an educational institution depends on the mutual participation and progressive cooperation from the students. To achieve the perfect goal of students, the role of Students' Union is unquestionable. The Students' Union performs tirelessly different developmental activities for the college. Beside the development of high consciousness in politics, they have made their roles felt in activities namely cultural, social and even athletics. A prime instance of their participation; are the blood donation camps that are regularly organized by them. The Students' Union takes initiatives for active participation of students in inter-college sports competitions. To develop the necessity and popularity of games among students, the Union constantly shows their leadership. The admission procedure of new students has become more comfortable due to cooperation by the Students' Union with the college authorities. The Students' Union effectively looks after the matter regarding the new students adjusting with the environment of the college campus. For this purpose, they are constantly cooperating with the college authorities. Besides this, the Students' Union takes different initiatives for the benefit of students in order to make them avail different government scholarships, in coordination with the college authorities. The Union regularly organizes different cultural programmes to spread a healthy cultural consciousness among students. The yearly college cultural programme named "Social" is organized in a proper and well versed manner. The Students' Union has emerged as an example through engaging themselves with the proper framework pertaining to the development of the college environment. Moreover the Students' Union helps to publish the yearly students' magazine "Unmesh", and opens opportunities for many new comers and existing students by allowing them to display their merits, their quality of writing, and also focuses on the development of various creations — both academic and artistic, by the students.

OBITUARY

Birth: 8th December 1959
Death: 19th December 2021

Our honorable Ex-Principal Dr. Shymal Karmakar has left us with sad memory of his demise and showed a way of is principles and teachings to be followed with Dr. Shyamal Karmakar who all of a sudden left us for heavenly abode on 19th December, 2021. Dr. Karmakar joined our college as Principal on 3rd July, 2015. He started his career as a Lecturer in Physics in Kandi Raj College, Murshidabad on 7th February, 1989. After serving there for around 24 years he joined Lalbaba College Belur as a Principal on 26th September, 2012. He was an erudite scholar and had several publications in national and international journals. During his tenure the college was accredited by NAAC in the second cycle. With his encouragement and effort the college opened the departments of Computer Science, Physics and Human Development. Smart classrooms were introduced in order to supplement and augment the traditional teaching-learning methodology. He initiated the process of installation of solar panel in order to save electrical energy and also to utilize the green energy. Under his dynamic leadership, the Ladies'(students') hostel was established and started functioning during his time. Dr. Karmakar envisaged the inspiring scheme of Special Financial Assistance to the economically disadvantaged students of the college by constituting a Fund out of the contributions made by the teachers of the college. This initiative was taken to help the students to cope with the unprecedented economic crisis unleashed by the pandemic. With his amicable nature he administered the college keeping harmony among all the stakeholders—the students, the teachers and the members of the non –teaching staff. We all express our compassion to the bereaved family members of Dr. Karmakar. It is our duty to carry out his unfinished work. We pay our utmost respect and heartful homage to his noble souls so that he can rest in peace.

সূচিপত্র

‘ভারতপথিক, দ্বি সার্ধশতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি **ড. বিদিশা ঘোষ দস্তিদার** ১৪

তবু ভরিল না চিত্ত **ড. মন্টুরাম সামন্ত** ১৯

কয়েকটি কথা তোমাদের সাথে **ড. সৈকত মণ্ডল** ২২

ভারতবর্ষে মমি দর্শন ও লাহুল-স্পিতি ভ্রমণ **ড. পার্থসারথি দত্ত** ২৫

Crossing the Fence **Dr. Sukanta Das** ২৮

অণুকথা-১ : ছাদ **দেবদ্যুতি কর্মকার** ৩১

অণুকথা-২ : জানলা **দেবদ্যুতি কর্মকার** ৩২

Book a Date with a Book! **Dr Sreyasi Chatterjee** ৩৩

বানগড়ের ইতিকথা **সুদর্শনা সরকার** ৩৫

শরৎচন্দ্র, এখনও একইরকম **ড. উত্তরা কুণ্ডু চৌধুরী** ৪০

আর্তি **ড. শর্মিষ্ঠা মিত্র** ৪১

শিশু উৎসব **মনোলীনা শেঠ** ৪২

বাংলা নাটক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার প্রসঙ্গে মনোজ মিত্রের নাটক
‘চাক ভাঙা মধু’ এবং ‘সাজানো বাগান’ **ভবানী কর** ৪৩

স্বাধীনতা সংগ্রামে বিস্মৃত নারীবিপ্লবী **দিশা খাসনবীশ** ৪৮

Women Empowerment **Puja Kumari** ৫১

“The Effect of Malnutrition on Development” **Soumyajit Kundu** ৫২

Importance of Handloom Sector **Dr. Sharmistha Ray** ৫৫

দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরের ইতিবৃত্ত **প্রীতি বিশ্বাস** ৬০

কম্পিউটারের বিবর্তনের ইতিহাস **রজতশুভ্র ঘটক** ৬২

সৃষ্টিনাশা **হৃষিকা নন্দী** ৬৭

দরজার আড়ালে **তিয়াশা চৌধুরী** ৬৮

Anxiety Disorder **Manisha Chatterjee** ৭০

অন্তত **শ্রীতম রায়** ৭২

আজও কাঁদে দুর্গা **ঈষা ঘোষ** ৭৪

মায়ার বাঁধন **অনির্বাণ মুখার্জী ৭৬**
হাসি **বাস্তব বিশ্বাস ৭৮**
মানব বিকাশ : আমার জীবনের অধ্যায় **কাহিনী ভট্টাচার্য্য ৮০**
What if you lived on Mars for a day ? **Sabarna Jana ৮২**
UNKNOWN SIGNAL **Sabarna Jana ৮৬**
উত্তর আধুনিক যুগ, ভারতের জনস্বাস্থ্য এবং 'আমরা' **স্বাগতিকা সেন ৮৮**
২৬শে এপ্রিল **কাহিনী ভট্টাচার্য ৯৫**
ভারতের দারিদ্রতা সমস্যা **শ্রেয়া হালদার ৯৭**
সবুজ বিপ্লব **শর্মিষ্ঠা সামন্ত ১০০**
Eyes Feeling Pain **Sudarsana Sarkar ১০৪**
প্রত্যাবর্তন **শুদ্ধরাগ বিশ্বাস ১০৫**
জ্যোৎস্না ধোঁয়া শহর **সোহম পাল ১০৫**
ইচ্ছা **শর্মিষ্ঠা সামন্ত ১০৬**
তোমায় **সুস্মিতা দাস ১০৭**
নতুন বছর **গায়েত্রী নায়েক ১০৮**
চিন্ময়ী মা **অনিকেত কুমার দত্ত ১০৮**
রক্তিম ৭১ **অনিকেত কুমার দত্ত ১০৯**
জন্মদিনের প্রাক্কালে **অনিকেত সাহা ১০৯**
ভুল **সোনি সিং ১১০**
অভিযান **বাস্তব বিশ্বাস ১১০**
If A Krishna Could Be a Lion **Nisha Shaw ১১১**
An Innocent Dawn **Rahul Banerjee ১১১**
A Brittle Hope **Manisha Karmakar ১১২**
Words to speak **Biswajit Nath ১১২**

‘ভারতপথিক, দ্বি সার্ধশতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি

ড. বিদিশা ঘোষ দস্তিদার

সদস্য, কলেজ পরিচালন সমিতি, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ মহাবিদ্যালয়

অধ্যক্ষ, বাণীপুর মহিলা মহাবিদ্যালয়, উঃ ২৪ পরগণা

আঠারো শতকের শেষভাগে বাংলার সামাজিক ও রাজনৈতিক বাতাবরণে ঘোর অন্ধকার যুগের সূচনা হয়। পলাশীর যুদ্ধের শেষে, লর্ড ক্লাইভ মোগল সম্রাটের কাছ থেকে দেওয়ানী আদায় করে, বাংলার গভর্ণর পদে আসীন হলেন, এবং ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী, বাণিজ্যের সাথে সাথে, শাসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হল—“বণিকের মানদণ্ড পোহালে শর্বরী। দেখা দিল রাজদণ্ড রূপে”।

ওয়ারেন হেস্টিংস, কর্ণওয়ালিস, ওয়েলেসসি, প্রমুখ ধুরন্ধর শাসকবর্গের রাজত্বকালে, কোম্পানীর শাসন এদেশে দৃঢ় প্রোথিত হয়, এবং দরিদ্র ও শ্রমজীবি সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশা চরমে ওঠে।

লর্ড কর্ণওয়ালিস যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলন করলেন, তখন দেশীয় ভূস্বামী ও জমিদার বর্গ খাজনা আদায়ের জন্য কৃষক ও অন্যান্য প্রান্তিক শ্রমজীবি মানুষের ওপর চূড়ান্ত অত্যাচার শুরু করে দিল। কোথাও কোথাও বনেদী জমিদারবংশ জমিদারী হারিয়ে নিঃস্ব হলো, আবার সেই জমিদারী কমদামে কিনে অনেকে হঠাৎ বড়লোক হয়ে বসল। ১৮১৩ সালে প্রবর্তিত নূতন আইনের বলে, ইংল্যাণ্ডের সকল শিল্পপতি, ভারতে তাঁদের শিল্পজাত দ্রব্যগুলি বিক্রয় করার অধিকার পেলেন, এর ফলে দেশীয় বৃত্তিধারী মানুষদের অন্নসংস্থান করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। কারণ ‘কলে তৈরি’ জিনিস দামে সস্তা, তাদের গুণমানও ভালো। এই সময়ের পূর্বে, কিছু কিছু দেশজ সামগ্রী বিলেতে রপ্তানী হতো, এখন সেটিও গেল বন্ধ হয়ে। একদিকে সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষের চরম দুদর্শা, অপরদিকে ব্যবসায়ী, ঠিকাদার, দালাল ও মধ্যসত্ত্বভোগী প্রভৃতি নূতন সামাজিক শ্রেণীর উন্মেষ ও তাদের কবলে বিপুল ধনরাশি যা বন্টন ব্যবস্থার চূড়ান্ত অসাম্যের ছবি।

আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন “এই সময়ে সহচর সম্পন্ন মধ্যবিত্ত ভদ্রগৃহস্থদিগের গৃহে বাবু নামে এক শ্রেণীর মানুষ দেখা দিয়াছিল। ...এই বাবুরা দিনে ঘুমাইয়া, ঘুড়ি উড়াইয়া, বুলবুলের লড়াই দেখিয়া, সেতার এসরাজ, বীন প্রভৃতি বাজাইয়া, কবি, হাপ আখড়াই, পাঁচালী প্রভৃতি শুনিয়া, রাত্রে বারাঙ্গনাদিগের আলয়ে আলয়ে গীতবাদ্য ও আমোদ করিয়া কাল কাটাইত, এবং খড়দহের মেলা ও মাহেশের স্নানযাত্রা প্রভৃতির সময় কলিকাতা হইতে বারাঙ্গনাদিগকে লইয়া দলে দলে নৌকাযোগে আমোদ করিয়া যাইত।”

এই আমোদ আহ্লাদের অনুষঙ্গেই তৎকালীন বাবু বর্গ ধর্মজীবন যাপন করতেন। সাড়ম্বরে দুর্গাপূজা, বারাঙ্গনা সমভিব্যহারে ধর্মস্থানে গমন, যে কোনো পূজা উপলক্ষ্যে গৃহে বাইজির নাচ, সাহেব সুবোদের নিমন্ত্রণ জানানো এবং যথেচ্ছচার ও মদ্যপান ইত্যাদি এই সব ধর্মানুষ্ঠানের আবশ্যিক অঙ্গ হয়ে উঠেছিল।

কালিমালিপ্ত ও অবক্ষয়িত সমাজের ভগ্নাবশেষের ওপরেই অবশ্য নূতন ঊষার স্বর্ণদ্বার একটু একটু করে উন্মুক্ত হতে শুরু করে। লর্ড ওয়েলেসলির শাসনকালে ব্যাপটিস্ট মিশন ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ

প্রতিষ্ঠিত হল। যদিও খ্রীষ্টধর্মের প্রসার এবং শাসনকার্যে সহায়ক কেরানী তৈরি করার উদ্দেশ্য নিয়েই মিশন ও কলেজের আত্মপ্রকাশ, তথাপি পরোক্ষভাবে এ-দেশের সাধারণ মানুষের মানসিক ভুবন আলোচিত করার কাজে ব্যাপটিস্ট মিশন ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করে।

খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে মিশনারিরা এদেশে মুদ্রণযন্ত্রের স্থাপন করে। ১৮০০-১৮৩৪, এই সময়কালে শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস থেকে ৪০টি ভাষায় ২৬১ টি পুস্তকের ২ লক্ষ ১২ হাজারটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সাধারণ মানুষ এতোদিন অন্ধের মত, সমাজে প্রচলিত আচরণ আর মুখে মুখে বলে যাওয়া কথা শুনে সমাজ ও ধর্ম তথা কর্তব্য, অকর্তব্য বা উচিত অনুচিত সম্পর্কে ধারণা করত ও সেই মত জীবন পরিচালনা করত। এখন পুস্তক পাঠ করে তারা পৃথিবীর বিপুল কোন ভাণ্ডারের আস্বাদন লাভ করল। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ উইলিয়াম কেরী এবং তাঁর সহযোগী পণ্ডিত বিদ্যাগীরা বাইবেল গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেন এবং সংস্কৃত কিছু গ্রন্থও অনুবাদ করেন। তাঁরা কিছু গ্রন্থ রচনাও করেছিলেন, বাংলা লেখ্য গদ্যভাষার আদিরূপের সাক্ষী সেই গ্রন্থগুলি সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রথম আলোকবর্তিকা রূপে কাজ করে।

এই সময়েই বঙ্গদেশে সাময়িকপত্র তথা সংবাদগুলিও প্রকাশিত হতে শুরু করে। যদিও কতিপয় এদেশীয় শিক্ষিত ধনী যুবকই এই সংবাদপত্রগুলির পাঠক ছিলেন, তবু তাঁদের মাধ্যমে দেশের অন্যান্য অংশের মানুষ, দেশ ও রাজনীতি, সমাজনীতি, শাসকবর্গের মনোবাসনা, অনুসৃত নীতি ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করত, এবং বিতর্ক-বিবাদ ও প্রতিবাদের বাতাবরণ ধীরে ধীরে তৈরী হচ্ছিল।

এইরকম সামাজিক পটভূমিকায় জন্ম নিলেন রাজা রামমোহন রায়, আমাদের দেশের সমাজ জীবনে তাঁর হাত ধরেই প্রবেশ করল নূতন যুগ, রেনেশাঁ বা নবজাগরণের উন্মেষ ঘটল।

১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দের ২২ মে, হুগলী জেলার খানাকুল গ্রামের কাছে রাধানগরে, পিতা রামকান্ত ও মাতা তারিণীদেবীর ক্রোড়ে জন্ম হয় রামমোহনের।

অত্যন্ত বুদ্ধিমান এই বালক গ্রামের পাঠশালায় সংস্কৃত, বাংলা এবং কিছুটা পারসি ভাষা শেখেন। পরে, পাটনা ও বারানশীতে তিনি উত্তমরূপে আরবি ও পারসি এবং সংস্কৃত ভাষা শেখেন ও মহাপণ্ডিত রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁর আরবি, পারসি ও মুসলমান ধর্মশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য মুসলমান সমাজের শিক্ষিত ব্যক্তিরা তাঁকে 'জবরদস্ত মৌলভি' নামে আখ্যায়িত করে।

বিস্তৃত রূপে বেদ ও উপনিষদ এবং কোরান শরিফ অধ্যায়ন তাঁর চিন্তা ও মননে একেশ্বরবাদের প্রতি আগ্রহ বিকশিত করে। বস্তুত সে সময়ে হিন্দুধর্ম পালনের নামে যা প্রচলিত ছিল তা হল কু-আচার ও কুসংস্কার।

কৌলিন্য প্রথার নামে এক শ্রেণীর লুব্ধচিত্ত ব্রাহ্মণ, বহু সংখ্যক দার পরিগ্রহ করতেন। সতীপ্রথার নামে জীবন্ত রমনীকে মৃত পতির চিতার সাথে বেঁধে পুড়িয়ে মারা হত।

রামমোহনের নিজের বৌদি, মাত্র সতেরো বছরের তরুণী অলকাসুন্দরীকে তাঁর মৃত দাদার চিতায় জীবন্ত দগ্ধ করা হয়। সতীপ্রথার নামে প্রিয় বৌদিকে এইভাবে হত্যা করার ঘটনা, বালক, রামমোহনের মনে গভীর রেখাপাত করে এবং পরবর্তীকালে সারা জীবন ধরে এই জঘন্য প্রথা বিলোপে তিনি উদ্যামী ও উৎসাহী ছিলেন। তাঁর অকুণ্ঠ প্রয়াসেই 'সতীদাহ' প্রথা এ দেশে আইন করে বন্ধ করা হয়।

কলকাতায় উইলিয়াম কেরী এবং তাঁর সহকারী পণ্ডিত বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের সাথে বারাণসী প্রত্যাগত যুবক রামমোহনের সাক্ষাতে ও সৌহার্দ্য গড়ে ওঠে এবং ১৭৯৭ সালে রামমোহন, কেরী ও বিদ্যাবাগীশ মশাই একত্রে 'মহানির্বানতন্ত্র' নামক গ্রন্থ রচনা করেন যা একেশ্বরবাদ সম্পর্কে তাঁর চিন্তাভাবনার প্রথম প্রামান্য দলিল বলে ভাবা যায়।

এই সময়ে রামমোহন কলকাতার স্থায়ী বাসিন্দা, তিনি 'বেনিয়া' বা টাকা ঋণ দেবার কাজ করেন, পাশাপাশি তিনি একই সাথে ইংরেজের ন্যায়ালয়ে 'পণ্ডিত' রূপে কাজ করেন, তাঁর দায়িত্ব হল জমিজমা সংক্রান্ত মোকদ্দমায় দেশীয় আইন কি বলছে ইংরেজিতে তা বুঝিয়ে দেওয়া। ইতিমধ্যে তিনি ইংরেজী শিখেছিলেন, এবং এই সময় থেকেই তিনি গ্রীক ও লাতিন শিখতে শুরু করেন।

১৮১৫ সাল অবধি রামমোহন ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর 'রাইটিং সার্ভিস' বা কেরানী রূপে কাজ করেন, এই সময়ে তিনি মুর্শিদাবাদে থাকতেন, এরপর তিনি রংপুরে চলে যান, এবং সেখানেও সরকারী কর্মে নিযুক্ত থাকেন। এই সময়ে বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের সাথে রামমোহনের পুনরায় যোগাযোগ ঘটে এবং উইলিয়াম কেরীর সাথেও আবার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ইতিপূর্বে পেশাগত কারনে নানাস্থানে ঘোরাঘুরি কালে এই ত্রয়ীর যোগাযোগ শিথিল হয়ে পড়েছিল।

মুর্শিদাবাদে বসবাস করার সময় রামমোহন 'তুফৎ-উল-মুওয়াহ্বিদিন'—নামক গ্রন্থ রচনা করেন, পারসি ভাষায়। গ্রন্থটির ভূমিকা তিনি আরবি ভাষায় লেখেন, এটিও একেশ্বরবাদের ওপর ভিত্তি করে রচিত।

রামমোহনের জীবনীকার শ্রীমতী কলেট (Ms S. D Collte) বলেছেন ...''he was above all, and beneath all a religious persouality" অর্থাৎ রামমোহন সর্বোপরি ছিলেন একজন ধর্মানুরাগী ব্যক্তিত্ব বাস্তবিকভাবেই একথা সত্য।

রামমোহন সমাজ, নারীদের প্রতি সামাজিক অবিচার, শিক্ষাব্যবস্থা, ইংরেজদের শোষণনীতি ও রাজনীতি—এই সকল বিষয়েই অনাচার ও অসাম্যের প্রতিকারে তাঁর দুর্দমনীয় মেধা, ব্যক্তিত্ব ও কর্মশক্তি নিয়োগ করেছিলেন, কিন্তু প্রকৃত ধর্ম কি এবং কিভাবে তা সাধারণ মানুষের জীবনের আধার রূপে তা ব্যবহৃত হতে পারে সে সম্পর্কে তিনি আজীবন অনুসন্ধিৎসু ছিলেন। পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে 'একমোদ্বিতীয়াম' ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধি এবং তার জন্য যথার্থ ধর্মজীবন গড়ে তোলাই ছিল তাঁর গভীর প্রভাশীল মনের এষণা। এই ধর্মচারণার ছত্রছায়ায় সাধারণ মানুষকে নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে তিনি বেদান্তচর্চার সূত্রপাত করেন। শুধু ধর্মগ্রন্থ প্রণয়ন নয়, 'আত্মীয়সভা' ও 'ব্রাহ্মসমাজ' স্থাপনা এবং আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রহ্মোপাসনা তথা 'ব্রাহ্মধর্মের' প্রতিষ্ঠা করে ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ হিসাবে তিনি যা মনে করতেন, সেই একেশ্বরবাদের পক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে সদর্থক কাজ করেন। তিনি ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরোধী ছিলেন না। বস্তুতঃ বেদান্ত তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মোপলব্ধিই যে ব্রাহ্মণ্যধর্মের মূল কথা, তা তিনি মানুষকে জানাতে চেয়েছেন। বারাঙ্গনা-সহযোগে মাহেশের স্নানযাত্রা গমন যে অদ্দপেই কোনো ধর্মাচরণ নয়, মানুষের কু-প্রবৃত্তির নগ্ন প্রদর্শন মাত্র, তা তিনি বিশেষভাবে জানিয়ে, মানুষকে সতর্ক করতে চেয়েছিলেন। সেইজন্যই ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ব্রাহ্ম-সভা স্থাপন করেন এবং 'সতীদাহপ্রথা' বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ এ-সবের বিরুদ্ধে লেখনী ও কর্ম মাধ্যমে সোচ্চার হন, ও এই

সকল কুপ্রথা অবলুপ্ত করার জন্য ইংরেজ সরকারের কাছে আবেদন করেন। যখন লর্ড বেন্টিক ‘সতীদাহ’ প্রথা রদ করার আইন পাশ করলেন তখন রামমোহন ও আরো কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রজন বেন্টিঙ্ককে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তাঁরা লেখেন ‘শ্রীল শ্রীযুক্তের অনুমতিত্রানে সমীপস্থ হইয়া হিন্দুপ্রজাদের স্ত্রী পরম্পরার জীবনরক্ষার জন্য মহামহিম ইদানীন্তন যে উপাদেয় নিয়ম করিয়েছেন এবং স্বেচ্ছাপূর্বক স্ত্রীবধকলঙ্ক আর আত্মঘাতের অতিশয় উৎসাহকারীরূপ দুর্ণাম হইতে চিরকালের জন্য এশরণাগত প্রজাদিগমোচন করিতে যে করুণাযুক্ত হইয়া সুসিদ্ধ যত্ন করিয়াছেন সেই পরোপকারের পুনঃ পুনঃ স্বীকার করতে অনুমতি প্রাপ্ত হয়।”

বহুবিবাহ রোধেও তাঁর নিরন্তর প্রচেষ্টা ছিল। ‘প্রবর্তক-নিবর্তক সম্বাদে’ তিনি লিখেছেন— “আর যাহার স্বামী দুই তিন স্ত্রীকে লইয়া গার্হস্থ্য করে, তাহারা দিবারাত্রি মনস্তাপ ও কলহের ভাজন হয়” রামমোহন পিতা ও স্বামীর সম্পত্তিতে নারীর পূর্ণ অধিকারের স্বপক্ষে মত দান করেছেন।

তিনি জাতিভেদ প্রথার ঘোর বিরোধী ছিলেন। শাস্ত্র থেকে উদ্‌বৃত্ত করে তিনি দেখিয়েছিলেন, ব্রাহ্মণকূলে জন্ম নিলেই কেউ ব্রাহ্মণ বা শূদ্রের গৃহে জন্ম নিলেই কেউ শূদ্র হয় না।

“করতলস্থিত আমলকী ফলে যেমন নিশ্চয় হয়, তাহার ন্যায় পরমাত্মর সভাতে বিশ্বাস দ্বারা কৃতার্থ হইয়া শম দমাদি সাধনে যত্নশীল এবং দয়া ও সরলতা, সত্য সন্তোষ ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট ও মাৎসর্য, দম্ভ, মোহ ইত্যাদির দমনে যত্নবান যে ব্যক্তি হন, তাঁহাকেই কেবল ব্রাহ্মণ শব্দে কহা যায়”

তিনি বুঝেছিলেন, দেশবাসীর মূয়তা, অন্ধ কুসংস্কার দূরীভুত করার জন্য প্রয়োজন শিক্ষার আলো এবং আশ্চর্য বিষয় এই তিনি প্রচলিত সংস্কৃত শিক্ষা এবং বেদান্ত শিক্ষারও ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁর যুক্তিবাদী মন বুঝতে পেরেছিলেন আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষার মধ্য দিয়েই দেশবাসীর জড়তা ও কুসংস্কার দূর হতে পারে।

তিনি লিখেছেন “..as the improvement of the native population is the object of the government, it will consequently promote a more libaral and enlightened system of instrustion, embracing Mathematics, Natural Philosophy, Chemistry, Auotomy with other useful science”

১৮৮২ সালে হিন্দু ছাত্রদের ইংরেজী শিক্ষাদানের বালক দেবেন্দ্রনাথ এই স্কুলের ছাত্র ছিলেন। তাঁর পৃথকরূপে বেদান্ত শিক্ষার জন্য তিনি ‘বেদান্ত কলেজ’ ও প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে প্রাচ্য ও পাশ্চত্য দর্শন পড়ানো হত। অর্থাৎ যিনি ইচ্ছুক, তিনিই শুধু সেখানে পড়তেন। কলকাতার ‘স্কুল বুক সোসাইটির সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল ও তিনি কিছু কিছু পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন।

রামমোহন ছিলেন প্রকৃত অর্থে একজন রাজনীতি সচেতন মানুষ। দেশে ও বিশ্বে যা ঘটছে সে বিষয়ে তাঁর প্রখর দৃষ্টি ও গভীর অনুশীলন ছিল। রাষ্ট্রপরিচালনা সম্পর্কে তাঁর সুস্পষ্ট মতামত ছিল।

প্রথমত : তিনি মনে করতেন, জ্ঞানের প্রসার ও সভ্যতার উন্নতি না হলে রাষ্ট্রবিপ্লব দেখা দেয়। শাসনব্যবস্থা স্থায়ী করতে গেলে জ্ঞানবিস্তারের দিকে নজর দেওয়া দরকার।

দ্বিতীয়ত : তিনি মনে করতেন, বিচারক হবেন নিরপেক্ষ, শাসক তাঁকে কোনোভাবেই প্রভাবিত করতে পারবেন না।

তৃতীয়ত : দেওয়ানী ও ফৌজদারি আইন লিপিবদ্ধ করে, জন সাধারণের জন্য পুস্তকাকারে প্রকাশ করা আশব্যক।

চতুর্থত : দেশীর শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গকে প্রশাসনের উচ্চপদে নিযুক্ত করা কর্তব্য।

ব্রিটিশ সরকারের কাছে মোগল বাদশাহের ভাতা বাড়ানোর জন্য তিনি আবেদন করেন, এবং তাঁর ‘‘রাজা’’ উপাধিও মোগল বাদশাহ প্রদত্ত। প্রকৃত প্রস্তাবে বলা যায় এ-দেশের প্রাক্তন ও তদানীন্তন, উভয় শাসনকুলই রাজা রামমোহন রায়ের সাহায্য প্রার্থী ছিলেন, ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থের কারনে, যার মূলে কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, যা শাসকবর্গকে প্রভাবিত করে।

ভারতের বাইরে সংঘটিত বিপ্লব-বিদ্রোহ ও বিদ্রোহীদলের জয়ের কাহিনী রামমোহনকে বিশেষভাবে উল্লখিত করে তুলত। দক্ষিণ আমেরিকা স্পেনের অত্যাচারমুক্ত হলে, তিনি আনন্দে তাঁর গৃহে একটি ভোজসভার বন্দোবস্ত করেন।

ফরাসী বিপ্লবের পর, একটি ফরাসী জাহাজ রামমোহনের ইংল্যাণ্ডগামী জাহাজের সম্মুখস্থ হলে তিনি দুটি জাহাজই থামিয়ে, তারপর ফরাসী জাহাজে উঠে, জাহাজের সকল ব্যক্তিকে বিপ্লব সংঘটনের জন্য অভিনন্দন জানান।

বহুগ্রন্থের রচয়িতা রামমোহন বাংলা লেখ্য গদ্যভাষাকে একটি মার্জিত রূপ প্রদান করেন। তাঁর ভাষা প্রয়োজনানুযায়ী কখনো অতি সরল ও সুগম, কখনো বা বৈদগ্ধদীপ্ত। যতোচিত ছেদ ও যতিচিহ্নের ব্যবহার মূলতঃ তিনিই প্রথম বাংলাভাষায় ব্যবহার করেন।

তাঁর দ্বারা প্রকাশিত ‘সম্বাদ কৌমুদী’ দেশীয় মানুষের আশা ও আকাঙ্খার কথা বলত। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, রাষ্ট্র পরিচালনা বিষয়ে বিভিন্ন মতামত ‘সম্বাদ কৌমদী’তে প্রকাশিত হয়।

রামমোহনের জন্মের আড়াইশো বৎসর পূর্তি হচ্ছে এই বছর। দীর্ঘ সময় পেরিয়ে এসেও আজ তাঁর চিন্তা ভাবনা সমান প্রাসঙ্গিক ও মূল্যবান।

বাংলার নবজাগরণের পথিকৃৎ, নারী সমাজের দুঃখ, দুর্দশা নিরসনের অগ্রপথিক। শিক্ষা বিস্তারের কাজে নিরলস যোগী এবং প্রকৃত অর্থে ভারত পথিক রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতির প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা।

তবু ভরিল না চিত্ত

ড. মন্টুরাম সামন্ত
(প্রাক্তন অধ্যাপক, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ মহাবিদ্যালয়
অধ্যক্ষ, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র মহাবিদ্যালয়)

দেখিয়াছি আমি পৃথিবীর রূপ,
ঘ্রাণে লভিয়াছি গন্ধ;
কর্ণে শুনেছি প্রকৃতির গান,
নিতি হেরি তারি ছন্দ।
সেই রূপ, রস, গন্ধ, বর্ণ
প্রাণে সাড়া তোলে নিত্য;
জীবন ভরিয়া লভিনু সে স্বাদ,
তবু ভরিল না চিত্ত।

বরষার দিনে বসি নিরজনে
দেখেছি নদীরে সরবে
ছুটিয়া চলিছে দুরন্ত বেগে,
বুক ফুলে ওঠে গরবে।
দেখিয়াছি আমি শুখা মরশুমে
সেই নদী বড় শান্ত;
যেন বহিতেছে শান্তির ধারা,
তীরে বসে আমি পান্থ।

বিজন নিদাঘে সরসীর তীরে
বসেছিনু নিরদ্বন্দ্ব;
ঝাঁক বেঁধে মাছ করিতেছে খেলা,
সে কি অপরূপ ছন্দ।
শিকারের লোভে একক সর্প
দূর হতে এলো ধাইয়া;

চকিতে মাছেরা লুকালো সলিলে,
সাপ রহে শুধু চাহিয়া।

পাহাড়ের বুকে দেখেছি যে আমি
কত গাছ সারি সারি;
যেন সে শিল্পী আঁকিয়াছে ছবি,
দিয়েছে সে রঙ বাহারী।
সে রূপের টানে পাহাড়ের পানে
আসিয়াছি ফিরে ফিরে,
তবু না মিটিল অপূর্ণ সাধ
পাহাড়ী ঝোরার নীরে।

দেখিয়াছি আমি মরুভূমিরূপে
ধূ ধূ বালুকার প্রান্তর;
বালুকারাশির সাজানো পাহাড়
হেরি ভরিয়াছে অন্তর।
মরুদ্যানে তার খেজুরের গাছ
আর সুশীতল ছায়া;
সূর্যাস্তের অস্তরাগেতে
সে কি মধুময় মায়া।

নীল সাগরের বুকে দেখিয়াছি
কত বড় বড় ঢেউ;
তীরে এসে কেন পড়িতেছে ভেঙে
বুঝিতে পারি না কেউ।
ঢেউয়ের পর ঢেউ গুনে চলি,
গর্জন শুনি তার;
তবু তো নয়ন হয়নি তৃপ্ত,
ফিরে আসি বারেবার।

মানুষের যত দ্বেষ, হিংসা,
যত কিছু অনাসৃষ্টি—
সব ভুলে যাই প্রকৃতির রূপে,
বিমোহিত হয় দৃষ্টি।
বেঁচে আছি যেন প্রকৃতির দানে,
প্রত্যাশী তারে নিত্য;
কত হেরিলাম প্রকৃতির রূপ,
তবু ভরিল না চিত্ত।

রচনা : ১৯/১০/২০২২, বেলা ১টা।
ভদ্রকালী, হুগলী।

কয়েকটি কথা তোমাদের সাথে

ড. সৈকত মণ্ডল
(ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপক, ডিরোজিও মেমোরিয়াল কলেজ, বাংলা বিভাগ।
সদস্য, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি পরিচালন সমিতি, প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশ মহাবিদ্যালয়)

বেশ কয়েকবছর হলো কলেজে শিক্ষকতার পাশাপাশি প্রশাসনিক কাজেও যুক্ত হয়ে পড়েছি। ইতিমধ্যে ঘুরে ফিরে বেশ কয়েকটি কলেজের পরিচালন সমিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসাবে নিযুক্ত হয়েছি। বর্তমানে সেই কলেজগুলির মধ্যে একটি প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ মহাবিদ্যালয়। আজ সেই কলেজ ও তার ছাত্র-ছাত্রী সম্পর্কে কয়েকটি কথা উল্লেখ করতে গিয়ে প্রথমেই বলি যে আমি এই কলেজে আমার দায়িত্ব পালন শুরু করেছিলাম কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ প্রয়াত শ্যামল কর্মকারের হাত ধরে। শুরুতেই তাঁর উষ্ণ অভ্যর্থনা আপ্লুত করেছিল আমাকে। নিষ্ঠাবান দৃঢ় কাজ পাগল মানুষটা হঠাৎ বিদায় নিলেন। তাঁর আরো অনেককিছু দেওয়ার ছিল। একেবারে বিনা নোটিশে চলে যাওয়া আজও মেনে নিতে পারিনা। বিষাদ কাটিয়ে এরপর কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক পার্থসারথী দত্তের নেতৃত্বে কাজ শুরু হয়। বড় ভালো মানুষ, কাজ বোঝেন। কাজ করার স্পৃহা ছিল। অল্প কয়েকদিনের মধ্যে ছাপ ফেলেছিলেন। অবশ্য নতুন অধ্যক্ষ অর্ণব ঘোষের আগমনে তাঁকে থামতে হলো। বেশীদিন হয়নি অর্ণববাবু কলেজে এসেছেন। তবে সদাহাস্য মানুষটি ইতিমধ্যে মন জয় করে নিয়েছেন সবার। কলেজটা নতুন হলেও চেয়ারটা অর্ণববাবুর কাছে নতুন নয়। এই চেয়ারে বসার পূর্ব অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি বসেছেন। সুতরাং বলাই যায় তিনি সফল হবেন এবং তাঁর সফলতা মানে কলেজের সাফল্য।

তবে আমি মনে করি কলেজের আসল সাফল্য ছাত্রছাত্রীদের সফলতার মধ্যে নিহিত। একদিকে গাছ দিয়ে মোড়া পিচের রাস্তা, একদিকে বড় একটি মিল, আর একদিকে মাঠ এমন পরিবেশই তো শিক্ষাঙ্গনের প্রকৃত পরিবেশ হওয়া উচিত। এতে মনের বিকাশ খুব ভালো হয়। বিরাট প্রকৃতির কোলে ছোট্ট এই কলেজটির ছাত্র-ছাত্রীরাও বেশ মিষ্টি স্বভাবের। তাহলে কি আর বাকি রইলো। সফলতা তো হাতের মুঠোয়। কিন্তু সফলতার অর্থ কি? শিক্ষান্তে সফলতার মানে কর্মজগতের মধ্যে প্রবেশ এ-নিয়ে দ্বিমত নেই। তবে কি শিক্ষাগ্রহণের আর কোন উদ্দেশ্য নেই?

ছাত্র জীবনের এক মারাত্মক সময় স্নাতকস্তরের সময়টি। মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিকের কৈশোর অবস্থা কাটিয়ে হঠাৎ যৌবনে পা দিয়ে একসাথে বুঝে ওঠার আগেই অনেকটা রঙিন জগৎ, এর কোনটা গ্রহণ করব কোনটা বর্জন করব সেটা বাছার সময়ও পাওয়া যাচ্ছে না, কারণ রাতে বেছে রাখার পরে সকালে কলেজে গিয়ে আবার নতুন একটা দিন নতুন কিছু দেখে মাথাটা পুরো ঘুরে যাচ্ছে। অথচ প্রকৃত জীবন গড়ার সময় এটি। যে জীবন কেবল কর্মজীবন নয়। এই সময় থেকেই আমাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অন্যেরা নোটিশ করতে শুরু করে। এতোদিন যা বাচ্চা ছেলে বোঝে না বলে কেটেছে এখন থেকে সেই না বুঝে

করা কাজগুলি করেই চলতে থাকে তার মূল্যায়ণ। সেই মূল্যায়ণ বাকি জীবনের সবকিছুতেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

তাহলে কি করব? প্রথমেই বলি প্রত্যেক বয়সেরই আলাদা আলাদা স্বাদ আছে আর তার মজাও আছে তাই তা গ্রহণ করতেই হবে। তা না হলে জীবন বৃথা। কিন্তু মনে রাখতে হবে শুধু আনন্দ উপভোগই জীবন নয়। কিম্বা উল্টোদিক দিয়ে বললে আনন্দ উপভোগকে দীর্ঘস্থায়ী তথা আজীবন ধরে রাখতে গেলে জীবনটাও গড়তে হবে। তোমরা যদি আগামী পাঁচ বছর জীবনের একটি লক্ষ্য নিয়ে কঠোর পরিশ্রম করো তবে নিশ্চিত কোন না কোন সাফল্য পাবেই। তাই সমস্ত স্বাদ গ্রহণের মধ্যেও লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে হবে না। আর কলেজ জীবনে চার কোনায় অনেক আনন্দের মাঝে যে কোনটায় মন্দির বা মসজিদ বা গীর্জা আছে অর্থাৎ শ্রেণী কক্ষ, সেই শ্রেণী কক্ষটাকে লক্ষ্যপূরণের পূর্ণস্থল ভাবতে হবে। মনে রাখবে শিক্ষা কেবল কর্ম দেয় না বা কর্ম প্রদানই শিক্ষার একমাত্র কাজ নয়। তাই যদি হত তাহলে তো সবথেকে ভালো হতো শিক্ষিত হয়ে শিক্ষক হওয়া। তুমি বাংলায় স্নাতক হয়ে যদি পুলিশের চাকরি পাও তাহলে বাংলার ঐ পাঠ্যগুলো তোমাকে তোমার চাকরিতে কি সাহায্য করলো। অন্যদিক দিয়ে বললে পুলিশের চাকরিতে তোমার বাংলা শিক্ষা প্রকৃত অর্থে কি কাজে লাগল। তাহলেই বুঝতে পারছো শিক্ষার কাজ কেবল কর্ম প্রদান নয়। শিক্ষার প্রকৃত কাজ আদর্শ মানুষ গড়া। যা কিছু শিখছো তা নিজের জীবনে প্রয়োগ করো। খুব ভালো করে মুখস্থ করলে হাসপাতালের সামনে গাড়ির হর্ণ বাজাতে নেই। অথচ অকারণে জোরে জোরে সেখানে তুমি-ই হর্ণ বাজালে যেমনটি আকছার সবাই বাজায়। তাহলে কি মুখস্থ করলে শুধু পরীক্ষার খাতায় উত্তর লিখে নম্বর পাওয়ার জন্য। গ্রহণ করো ভালো যা আছে এ জগতে আর তা প্রয়োগ করো নিজের জীবনে।

নিজের অক্ষমতা ঢাকার জন্য অক্ষম অন্যকে উদাহরণ হিসাবে দাঁড় করিও না। যে সক্ষম তাকে আদর্শ করে তার মতো হয়ে ওঠার চেষ্টা করো। সম সময় ইতিবাচক কিছু ভাবো। নেতিবাচক কিছু ভেবো না, বিদ্বেষ, ঘৃণা এগুলো মনে প্রশ্রয় দিও না। উন্নত হও। মনে রাখবে ছোটগাছের ডাল সব সময় উপরের দিকে মাথা তুলে রাখে, কাউকে ছায়া দিতে পারে না। বড় গাছের ডাল নিচের দিকে নুইয়ে থাকে আর অন্যকে ছায়া দেয়। তুমিও এমন হও যে তোমার ছায়ায় সুশীতল হবে অনেকে। এমন কিছু করো যাতে মনে রাখে সবাই। বিপদে তোমাকেই খোঁজে। দুঃখেও তুমি আনন্দেও তুমি এমন অপরিহার্য করে তোল নিজেকে। একবার শুধু একবার কারো উপকার করে দেখ কি আনন্দ তাতে। যে আনন্দ তুমি অন্য কোন কিছুতে পাবে না।

আর এ সমস্ত তুমি করায়ত্ব করতে পারবে যদি উপযুক্ত শিক্ষায় নিজেকে তৈরী কর। তোমার হাতে অনেকটা সময়, নষ্ট করো না। সময়টাকে কাজ লাগাও এটাই আসল সময় চলে গেলে পাবে না। তখন সারা জীবন দুঃখে কাটবে। কটা দিন কৃচ্ছসাধন করো। গোটা জীবন আনন্দ করতে পারবে। সময় বয়ে যাচ্ছে কিন্তু চলে যাচ্ছে না। আনন্দের দিন অনেক পড়ে। গোটা জীবনকে সুমধুর করতে পারলে তবেই তুমি সফল, আংশিক বা সাময়িক উচ্ছ্বাস, আনন্দের কোন গুরুত্ব নেই। বরং এটি ভবিষ্যতে বেদনাদায়ক

স্মৃতি হয়ে ওঠে। তাহলে সংকল্প করো আজ এখনই সব কিছু করবো কিন্তু আসল ভুলবো না। নত হও, স্থীর হও, আদর্শবান হও, শ্রদ্ধাশীল হও, বিনয়ী হও। শিক্ষক-শিক্ষিকার দেখানো পথ বাবা-মা গুরুজনদের পরামর্শ অমান্য করো না। সাফল্য তোমার কাছে ধরা তবে দেবেই দেবে।

আমার এই কয়েকটি কথা তুমি শুধু শুনলেই হবে না। মানতে হবে। শুধু মানলে হবে না, জীবনে প্রয়োগ করতে হবে। কিন্তু প্রয়োগ করতে পারবে না যদি না মন-মস্তিষ্ক উন্নত করে গড়ে তুলতে পারো। আর তা পারবে পড়াশুনার প্রতি গভীর মনোনিবেশ করে। তখন দেখবে তোমার ঐ কলেজের শান্ত ঝিলের মতো ব্যাপ্ত হয়ে উঠবে তোমার চিন্তা তোমার চেতনা। এসো তবে সেই পথ অনুসরণ করি। কলেজের শিক্ষা শেষ করে একজন সম্পূর্ণ মানুষ হিসাবে নিজেকে গড়ে তুলে নিজের সাফল্য দিয়ে কলেজের সফলতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করি। কথা দিলে, দেখা হবে, মন ভালো করা প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশ কলেজের শান্ত সুশীতল পরিবেশে উজ্জ্বল কিছু মুখের সাথে আমার।

ভারতবর্ষে মমি দর্শন ও লাহুল-স্পিতি ভ্রমণ

ড. পার্থসারথি দত্ত
(অধ্যাপক, বাণিজ্য বিভাগ)

হিমাচল প্রদেশ আমার আগে দুবার ঘোরা। সাধারণত ট্যুরিস্টরা যে সব জায়গায় যান যেমন সিমলা, কুলু, মানালি, কল্পা, সাংলা ইত্যাদি। এবার ঠিক করলাম হিমাচল প্রদেশের একটু অপরিচিত জায়গায় যাবো। পুজোর ছুটিতে যাওয়া স্থির হল। আমরা দলে ৮ জন। গাড়ি ও হোটেল বুক করলাম চাঁদনি চক মেট্রো স্টেশানের কাছে ই-মেল এর দোতলায় হিমাচল প্রদেশ হেল্পলাইন ট্যুরিজম থেকে গন্তব্য লাহুল স্পিতি।

হাওড়া থেকে ট্রেনে করে সিমলা দিল্লী পৌঁছলাম। ট্রেন লেট হওয়ার কারণে আমাদের সিমলা পৌঁছতে রাত ১১টা বাজলো। রাতে নিঃঝুম ম্যালের রাস্তা দিয়ে হোটেলে পৌঁছে সোজা লেপের তলায়। পরের দিন সকালে বেরিয়ে বিকেলে সারাহান পৌঁছলাম। আগেও গিয়েছিলাম। কিন্তু ভীমাকালী মন্দির দর্শণ করবার জন্য একদিন ওখানে থাকলাম। মন্দিরের প্রশান্ত পরিবেশ ও চারপাশের নিসর্গ দৃশ্য মন ভরিয়ে দেয়। সন্ধ্যা আরতি দেখলাম চারদিকের পাহাড়ে ঘন্টাধ্বনির প্রতিধ্বনি এক মায়াবী পরিবেশ সৃষ্টি করে। পরদিন ভোরবেলা আবার মন্দির দর্শণ। মন্দির সংলগ্ন বাগানে ন্যাসপাতি ও আপেলের সমারোহ বেলা ১১টা নাগাদ রওনা হলাম কল্পার উদ্দেশ্যে। অপরূপ কল্পা, কিন্নরীদের দেশ, আগেরবার তিনদিন ছিলাম। এবার শুধু একরাত্রির বিরতি। ভালোই যাচ্ছিলাম, কিছুটা যাবার পরে দেখি রাস্তা বন্ধ, গাড়ীর লাইনের সারি। ক্রমান্বয়ে পাথর পড়ছে। নগরায়ণ প্রচেষ্টার কুফল। সারা হিমাচল ও উত্তরাখণ্ড জুড়ে JP-র দাপাদাপি। ফল ২০১৩ সালের কেদারনাথ বিপর্যয় ও এ বছরের জোশীমঠের ধ্বস। অপরিকল্পিত উন্নয়ণে একদিন সুন্দর হিমাচলও ধ্বংস হবে। যে পথ আগেরবার ৩ ঘন্টায় পৌঁছেছি এবার ঘুরপথে লাগলো ১০ ঘন্টা। রাত ৯-৩০টায় হোটেলে পৌঁছে কোনরকমে খেয়ে পথক্লান্তিতে নিদ্রামগ্ন।

পরদিন ভোরে উঠে দেখলাম দরজার সামনে আপেল গাছে লাল বড় বড় আপেল। গতকাল ঘরে ঢোকার সময় মাথায় কি একটা ঠক করে লেগেছিল, অন্ধকারে বুঝতে পারিনি। কল্পার সৌন্দর্য অতুলনীয়। আগের বার উপভোগ করেছি, তাই এবার আর হল না নতুন পথের যাত্রায় কিন্নর প্রদেশ ছেড়ে যাবো লাহুল-স্পিতি প্রদেশের দিকে। কল্পা থেকে রওনা হয়ে পু, খাব পেরিয়ে যাত্রাপথ, ধীরে ধীরে প্রকৃতি সবুজ থেকে রুক্ষ হয়ে উঠছে। খাব এ স্পিতি ও শতদ্রুর মিলনস্থলে রাস্তায় দাঁড়িয়ে একটু চা পানের বিরতি। আবার পথ চলা। প্রায় ৯০ কিমি পরে নাকো তে এসে পৌঁছলাম। দ্বিপ্রাহরিক আহার শেষ করে নাকো লেক ও মনাস্ট্রি দর্শণ, নাকো লেকের স্ফটিকস্বচ্ছ জলে পাহাড়ের প্রতিফলন ও চারিদিকের প্রস্তরখণ্ডে পালিভাষায় ভবগান বুদ্ধের বাণী খোদিত আছে। নাকো মনাস্ট্রিটা ছোট। নিস্তব্ধ পরিবেশ। প্রায় জনমানবহীন। ঘন্টা দুয়েক বিরতির পরে আবার পথচলা। আমরা প্রবেশ করছি লাহুল-স্পিতি প্রদেশে। সুমদো হয়ে টাবোর পথে ৩৩ কিমি যাবার পর ডানদিকে ৭ কিমি দূরে গিউ গ্রাম তোরণে লেখা স্বাগতম (অবশ্যই ইংরাজীতে)। প্রচণ্ড খারাপ রাস্তায় Tempo Traveller নাচতে নাচতে সন্ধের মুখে পৌঁছল গিউ (Gue) গ্রামে। এখানে ছোট্ট মন্দিরে কাঁচের বাক্সে মমি করা রয়েছে একজন বৃদ্ধের দেহ প্রায় ৭০০ বছর আগে উনি গ্রামের মানুষকে নিরন্তন সেবা করে দুরারোগ্য ব্যধি থেকে মুক্ত করেন। উনি কিন্তু উপবিষ্ট ভঙ্গীতে।

গ্রামবাসীদের বিশ্বাস যে প্রতি বছর ওনার চুল ও নখের বৃদ্ধি হয়। শিহরিত হলাম, ভারতবর্ষে মমি আছে দেখে। মিশর যাবার সুবিধা ও ক্ষমতা আমাদের সবার নেই। পরে পড়েছি এরকম আরও মমি আছে নানা বৌদ্ধ লামাদের হিমাচলের দুর্গম স্থানে। দেখলাম পিছনে একটি জাপানের তৈরী নির্মিয়মান মনাস্ট্রি। ওটি সম্পূর্ণ হলে ওখানে সমিতি স্থানান্তরিত হবে। এটি ২০১৮ সালের ঘটনা। এখন হয়তো মনাস্ট্রিটি পূর্ণাঙ্গ রূপ পেয়েছে।

চালক ভাই তাড়া লাগালেন যে আমাদের কিন্তু টাবো যেতে হবে। পথ যদিও বেশি নয় কিন্তু পাহাড়ি রাস্তা, অন্ধকার। প্রায় একঘন্টা বাদে টাবো পৌঁছলাম। চারিদিক অন্ধকার, প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, শুনলাম আজ সারারাত কারেন্ট আসবে না। যাইহোক আমাদের থাকার জায়গা বড় হোটেলটির চত্বরে একটি নির্মিয়মাণ ব্লকের একতলায়। একতলায় মাত্র তিনটি ঘর। যদিও সব সুবিধা আছে। আতিথেয়তার ত্রুটি হল না। গরমগরম ফ্রায়েড রাইস ও চিলি চিকেন সহ নৈশাহার শেষ করে সোজা ঘুম। ভোরে উঠে মুখ ধুতে গিয়ে দেখি কলে জল আসছে না। দোতলার ছাদে উঠলাম। সারারাত সদর দরজা খোলা ছিল। সমতলে ভাবা যায় না। ছাদে উঠে দেখি সবে সূর্যদেব উঁকি মারছেন। জলের ট্যাঙ্ক এর ঢাকনা সরিয়ে দেখি বরফ ভাসছে, কলে জল না আসার কারণ বুঝলাম। সোয়েটার জ্যাকেট পরে ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছি। একটু একটু করে সূর্যদেব প্রকট হলেন, দূরে টাবো মনাস্ট্রির সোনালী চূড়ায় রোদের ঝলক। চারিদিকে আপেল গাছে Golden Apple। পরে ঐ আপেল বাগানের মধ্যে দিয়ে টাবো মনাস্ট্রি গেলাম। আপেল কিন্তু ছেঁড়া যাবে না। ওনারা সবাইকে একটি করে দিলেন। যেমন সুস্বাদু তেমন রসালো। টাবো মনাস্ট্রিটি UNESCO-র World Heritage Site। ১০০০ বছরের পুরানো। মাটির তৈরী, দেওয়ালে নানারকম পেন্টিং ভগবান বুদ্ধের জীবনী নিয়ে। মোমবাতি জ্বলছে। Flash use করে ছবি তোলা মানা। আমরা একটি ছবি কিনলাম। পাশে নতুন মনাস্ট্রি তৈরী হয়েছে। লামা সন্ন্যাসীদের বাসস্থান। রোড সাইড ম্যাপ দেখাচ্ছে সিমলা থেকে ৪৬৬ কিমি দূরে ৩০৫০ মিটার উচ্চতায় আছি আমরা।

পথের ধারে লাঞ্চ করে ২ টার সময় রওনা হলাম ৪৭ কিমি দূরে কাজার দিকে। কাজা হল লাহুল স্পিতির মূল শহর। এই শহরে আছে ভারতের সর্বশেষ পেট্রোল পাম্প। পথে কী মনাস্ট্রির দর্শণ মিললো, পরের দিন যাবো। কাজায় আমাদের অবস্থান দু রাত। বিকেলে পৌঁছেই আগে Full Tank Petrol ভরা হল। SBI ATM কাজ করছে দেখে কিছু টাকাও তুলে নিলাম। BSNL লাইন চলছে, আর সব বন্ধ। বাড়ীতে ফোন করলাম। পাইন বনের মধ্যে দিয়ে একটু দূরে কাজা বাজার। টুকটাক পাহাড়ী জিনিস কিনে ৬.০০ টায় হোটেলে প্রবেশ। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, আমাদের এক দিদির একটু শ্বাসকষ্ট শুরু হল সঙ্গে সঙ্গে portable oxygen cylinder থেকে oxygen নিয়ে একটু সুস্থ হলেন। ওখানে oxygen কম, কারণ রুক্ষ প্রকৃতি।

পরের দিন কী মনাস্ট্রি ও কীব্বার গ্রাম (ভারতের সর্বোচ্চ) দেখলাম। Pin Valley-র treck route শুরুর স্থানটা দেখলাম। ওখানে Ibex দেখতে পাওয়া যায়। পরের দিনও আশপাশের ছোট ছোট দর্শণীয় স্থান দেখলাম এবং মূলত বিশ্রাম নিলাম। পরদিন ২০০ কিমি যাত্রা।

ভোর ছ'টায় কিছু শুকনো খাবার নিয়ে (কিশমিশ অবশ্যই চাই — শ্বাসকষ্ট না হওয়ার জন্য এটি মুখে রাখা দরকার)। কর্পূর শোঁকাও যায়। কাজা থেকে ঘন্টাখানেক বাদে লোসার জনপদ, শেষ জনপদ। স্থানীয় এক মহিলা পাহাড়ী ধান কাটছেন মনে পড়ে গেল 'Alone she cuts & binds the grain' একটু চা ও টিফিন করে এবার রওনা। প্রথম গন্তব্য কুনজুম পাস (৪৫৫১ মিটার)। মন্দিরের ঘন্টাধ্বনি পাহাড়ে প্রতিফলিত হচ্ছে। হাওয়ার চোটে দাঁড়ানো যাচ্ছে না। কুনজুম দেখার পর আগে দেখা রোটাং পাস

(৩৯৮০ মিটার) যেন কিছুই নেই। চারদিকে বরফ। কিছুদূর গিয়ে চন্দ্রতাল যাবার রাস্তা ডানদিকে ১৬ কিমি. কথা ছিল ওখানে যাওয়া হবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল বড় গাড়ী যাবে না। কাজা থেকে ছোট গাড়ী নিয়ে যেতে হবে, আরও দুদিন কাজায় থাকতে হবে। পথে অনেক বাইকার দেখলাম যারা ওপথে যাচ্ছে। কোজাগরী পূর্ণিমার রাতে লেকের পাশে তাঁবুতে থাকবে। এরপর প্রায় ১৪০ কিমি পথ। ছত্রু, ছোটাধারা কোথাও খাবার পেলাম। না। চারদিকে জনমানব শূন্য ধূ ধূ প্রান্তর। মাঝে মাঝে মিলিটারী ট্রাকের আনাগোনা ভাঙ্গা রাস্তা। গাড়ীকে সোজা জলশূন্য স্পিতির নদীখাতে নামিয়ে দিয়ে কিছুটা এগোনো হল। প্রায় বিকেল ৪.৩০টায় সময় গ্রামফুতে এসে কতগুলি ঝুপড়ি দোকানে ভাত, রাজমার তরকারী ও ডিম ভাজা খেয়ে প্রচণ্ড খিদে মেটালাম। শেষ খেয়েছি সকাল ৮.০০টায়। এর প্রায় ৩১ কিমি পরে কেলং পৌঁছলাম। এখান থেকে দুটো রাস্তা ভাগ হয়ে যাচ্ছে। একটি যাচ্ছে লাদাখের দিকে, অপরটি মানালির দিকে রোটাং পাস হয়ে।

কেলং থেকে রোটাং পাস হয়ে আমরা মানালির দিকে রওনা হলাম। দশেরার Procession এ আটকে মাড়ী থেকে ট্র্যাফিক জ্যাম ৪০ কিমি রাস্তা পেরোতে লাগলো ৬ ঘন্টা। রাত ১২টায় মানালি পৌঁছলাম। তখনও মানালিতে কলকাতায় পূজার অষ্টমীর সন্ধেবেলার ভীড়। সে আর এক গল্প, পরে শোনানো যাবে।

Crossing the Fence

Dr. Sukanta Das

(Associate Prof. of English)

After the first powerful plain manifesto
The balck statement of pistons, without much fuss
But gliding like a queen, she leaves the station

The Express — Stephen Spender

Ever since I read Khuswant Singh's 'Train to Pakistan', I developed an immense urge to cross the border by train. The journey by train has always been one of my favourite modes of travel, principally for the opportunity it offers in meeting different kinds of people. The long journey by train remains very close to my heart when I could grab a seat by the window. Grabbing the seat by the window in the suburban local train has been nothing less than an adventure. This (mis) adventurous possibility however is happily wished away in long distance train journeys when one may get the seat by the window if one proves to be a little lucky and the seats are available. Being a normally extrovert peroson by nature I like to strike a conversation or two with the co-passangers and enjoy observing people with all their idiosyncrasies and hear their little odd chit chat. The infinite possibility and unlimited expanse of life flash before my eyes when I get to catch little talks and vaired expressions–sometimes hidden, suppressed at times–of the travellers. Some are undertaking the journey to any hill sation to inject fresh lease of life in their otherwise drab life. Some are desperate to meet their dear ones before time lapses. So many diverse reasons to undertaken the journey. I always feel intrigued whenever I need to travel by train–sea of people with their unfathomable lives, and the casual acquaintance with a fellow passenger makes me dive into the ocean of life itself–deep, dark, impenetrable and varied.

When I got an opportunity to visit Bangladesh, I wanted to make sure I would cross the broder by train. Even before I boarded the train so many thoughts crowded my mind, and I was both ecstatic and anxious to visit the country the stories of which were heard so often. Thanks to technology the mystery associated with an unknown place gives way to informed knowledge about all possible details of an event. I gathered as much information as possible about the train and its paraphenalia beforehand, and this made things look easy and less haphazard. This however did not mar my enthusiasm and anxiety, as I was

anticipating the possible official rigmarole through which I need to go to board the train bound towards Dhaka. I reached Kolkata Station in the early morning and I felt fluttered to think I would slip into another country just by train. After the routine security check, when I stood in the queue for the immigration check, I contemplated on how all these procedures govern the border patrolling, how travelling to a place that had always been enmeshed in my ‘own’ conutry’s history could invite such an official procedure. When did the partition take place ? Where did it take place ?... along the border lines ? Could I really hope to see a different country ? ‘Other’ people ? All these stray thoughts crossed my mind and I boarded the train that would take me to the place...

As the train left the station and started moving towards its destination, I seemed to have been transported to a landscape, so familiar, yet strikingly unknown. It was really hard to imagine how pople collected a little bit of thier belongings with them in their search for a place they could call their ‘home’. The idea of ‘home’ has always been a confused, convoluted abstract thing for pople who had to leave their place one fine morning. The re-location has never been easy, and this is so pathetically true for those people who have more or less been living in close proximity with their place. Even today when we are blessed with technological assistance, the relocation itself is not entirely free fromm the residual baggage. My mind traversed a vast range of landscape...The little, unimportant talk with fellow passengers captivates my attention always, and I get to know a little bit about them. Most of the Bangladeshi people who visit India for a variety of reasons, mostly for medical reasons, seem to disprove the fact that West Bengal, for that matter India has been a separate country. Their frequent travel, and the scattering of acquaintances across India, particulary across the breadth and length of West Bengal make it easy for them to feel at ‘home’ in the foreign country, called India. I was wonderstruck to discover how the minute details of various lanes and bylanes of Kolkata were described with comparative ease and familiarity. This made me reflect on the idea of ‘alien/other’ places : places do not necessarily become ‘foreign’ only because of the fences erected in a particular geographical locale. When you slip in Bangladesh you don’t feel alien because of the culutre and language in which you inhabit. These thoughts travelled in my mind as the train gushed forth. When we reached ‘Darshana’ station, the first railway station on the other side of the border, we didn’t feel alienated save the exchange of the security forces in the station.

The sense of solidarity could be easily traced in the way people start conversation with others. The langauage, culture and the form of address while greeting others were so

familiar that one could hardly believe that their passports contained the immigration details. Such familiarity made me rehearse the plethora of terms and concepts entwined with borders and ‘home’. As a student of literature I had always been interested in pople’s lives, their lived expreience and the emotional investment in things apparently outside their lives. I heard stories from my friends, relatives about their original/ancestral ‘home’ that lay somewhere outside the border. While reading literary works, I tried to reconfigure the lives of pople who had to flee away from their places of birth. However understanding these concepts and making sense of the issues through emotional and intellectual investment never became so emphaticaly clear until I visited Bangladesh. One of my classmates who had to leave Bangladesh with his parents before he could finish his primary education there kept in touch with me over mobile phone during my week-long stay in Bangladesh. He told me beforehand that I must look straight at the left hand side of the train through the window after crossing a station in Bangladesh. He told me to wave a hand towards the place as if to assure it that he would visit the place very soon. Such emotional bonding with a place gives lie to all those artifical things that divide people. In this short life nothing matters except love–a sense of fellow-feeling, a kind of oneness with others, and these feelings and sentiments will always motivate us to cross the fence metaphorically!

অণুকথা-১ : ছাদ

দেবদ্যুতি কর্মকার

(সহকারি অধ্যাপক, সমাজতত্ত্ব বিভাগ)

শেষ কবে বাড়ির ছাদে গেছিলেন নিজের মতো সময় কাটাতে? প্রশ্নটা বেমানান হলেও তার উত্তর কিন্তু তৎক্ষণাৎ দেওয়া সম্ভব নয় অধিকাংশের পক্ষে। অথচ কিছু বছর পিছিয়ে গেলে, যখন মুঠোফোনের মুঠোয় দুনিয়া বাঁধা ছিলোনা, অথবা দুপুরের পর ভাত ঘুম দেওয়ার অবকাশ ছিল ছুটির দিনে, ঠিক তখন ছাদের এক অন্য মাত্রা ছিল।

আমার কাছে প্রথমেই ছাদ মানে অন্য অনেকের মতোই একটা নিজস্ব space, যেখানে মন ও চোখ দুই মুক্ত হয় ঘরের দেওয়ালের খাঁচার থেকে। ছাদ যেমন ডাক দেয় অবাধ্য হতে, তেমন না বলা অনেক অনুভূতি যেন মনে এসে পড়ে ছাদের থেকে আকাশের দিকে চোখ, মেললে।

আবেগের সাক্ষী হয়ে থাকে ছাদ। বাড়ির বড়দের বকা খেয়ে যেমন ছাদে লুকিয়ে কান্না যায়, ঠিক তেমনই প্রথম ভালোবাসার অনুভূতিও ছাদের সাথে ভাগ করে নেওয়া যায়। আসলে জায়গাটা এমনি, তার অবাধ মুক্তির হাতছানি যেন সকল দুঃখ, ক্ষোভ, অভিমান, অথবা হাসিকে আপন করে নেয়। ছোটো বয়সে ছাদে বসে গোয়েন্দা বা ভূতের গল্প পড়া যেমন, আরেকটু বড়ো হলে মুঠোফোনে বন্ধুর সাথে ভাব বিনিময়, বয়স্কদের শীতের দুপুরে রোদ্দুরে বসে থাকা—সব কিছুর সাক্ষী ছাদ।

চারপাশের পরিবর্তনের সাক্ষী ছাদ, পাশে বেড়ে ওঠা বাড়ির আকাশ ভেদ করে আরো ওপরে উঠে আকাশ ঢেকে দেওয়া থেকে শুরু করে দুর্গাপুজোর আলো, কোলাহল সবেতেই ছাদ তার অস্তিত্ব বজায় রাখে। ইদানীং কালে ছাদে গিয়ে চাঁদ দেখার সময় না থাকলেও এক চিলতে হাওয়া বা এক পশলা বৃষ্টি ভীষণভাবে ছাদে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানায়। এই আমন্ত্রণ যেন সাদামাঠা একঘেয়ে ঝাপসা হয়ে আসা দৈনন্দিন জীবনকে ছক ভাঙার বার্তা দেয়। আর পড়ে পাওয়া দু আনার মতো কখনো লোডশেডিং-এ চারপাশ অন্ধকার হলে সেই ছাদেই আমরা খুঁজে পাই আপাতঃ স্বস্তি।

তাই একটানা জীবনের ছন্দ থেকে হাঁপিয়ে উঠলে সময় করে ছাদে কিছুটা সময় কাটালে কিছু না হোক নিজেকে হালকা করা যায় এখনো...

অণুকথা-২ : জানলা

দেবদ্যুতি কর্মকার
(সহকারি অধ্যাপক, সমাজতত্ত্ব বিভাগ)

বাড়িতে জানলা বোধহয় সবার আগে ওঠে। দিনের শুরুটা সূর্যের প্রথম আলো ঘরের মধ্যে পৌঁছে দেয়। তারপর যত বেলা বাড়ে তত বাইরের ব্যস্ততা তার মধ্যে দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। ফেরিওয়ালার হাঁক, খবরের কাগজের ডাক, বাজারে বেরোনো দুই পড়শির মধ্যে আলাপ, কাক চড়াইয়ের অনধিকার প্রবেশ আরো কত কি। আরেকটু পরে জানলা ব্যস্ত হয়ে পড়ে ইস্কুল আর অফিসে বেরোনো মানুষদের নিয়ে। বেলা বাড়ার সাথে সাথে হয়তো অচেনা কোনো গলা জানলা দিয়ে আওয়াজ দেবে, ‘‘একটু শুনবেন?’’ না, সাবধানী গৃহিনী দরজায় যাওয়ার আগে নিরাপদ ভেবে জানলা দিয়েই জিজ্ঞেস করবেন কি ব্যাপার? উত্তর আসবে ‘‘অমুক কোম্পানি থেকে আসছি’’।

সারাদিন এমনি অনেক মানুষের বাইরের আনাগোনা, গাড়ির আওয়াজ, ঠেলা, রিকশার মানুষ পেরিয়ে রাস্তা দিয়ে লড়াই করে এগিয়ে যাওয়ার যন্ত্রণা—এসব কিছুই জানালার কাছে পরিচিত। আবার জানলা কখনো প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করার শপথের সাক্ষী মিছিলের কণ্ঠে।

তারপর যখন বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হয় তখন জানলা দিয়ে আধুনিক শহরের আলো এসে পড়ে। রাস্তায় তখন কাজ সেরে সকলের বাড়ি ফেরার পালা। সন্ধেবেলা বাড়ির সকলে মিলে বেড়াতে যাওয়া, বা পাশের বাড়ির টিভির অতি serious আলোচনা বা নাটুকে আলাপ-বিলাপ, সবটাই জানলার কাছে ধরা দেয়। ক্রমে রাত বাড়লে তার কাজও কমে আসে। যদিও দমকা বাতাসের জন্য তাকে কখনো জেগে থাকতে হয়। বর্ষায় তার বিড়ম্বনা, বৃষ্টির থেকে সে পাহারা দিয়ে ঘর আগলে রাখে। জানালা যেন একটা ক্যানভাস যেখানে সমস্ত জগৎটাই আঁকা হয়ে থাকে। তার নেই বিশ্রাম, আছে অবিরত ছবি।

Book a Date with a Book!

Dr Sreyasi Chatterjee
(Assistant Professor; Department of Sociology,
Prasanta Chandra Mahalanobis Mahavidyalaya, Kolkata)

"A reader lives a thousand lives before he dies". George R.R. Martin

Books are magical keys that can open up new worlds and change perspectives. If I were to take a sneak peek into your bags I would definitely find a mobile phone there, earphones, some cash, maybe a half eaten chocolate bar, but would I find a dog-eared, slightly musty smelling book? Probably not. We as a generation have grown to like everything that happens in an instant, just like our two-minute cup noodles. We love Instagram because here too we can instantly share our photos and videos. Books seem a little old fashioned to us because we consume so much information and text on social media that when it comes to actually reading the things of your choice, we totally lose interest. Status messages, tweets, insta handles bring down our concentration levels considerably because the mind gets used to getting information in less words. Since we keep our eyes, fingers and minds busy scrolling through reels and feeds all day long, in all likelihood you won't want to read anything after that. Reading feels cumbersome to us and very often the only books that we read are forced upon us by our teachers as part of our curriculum. But reading a good book, beyond the stipulated reference texts of your syllabi, can actually be a good investment of your time. When you engage yourself with a good book, you actually end up spending a few hours reflecting upon its content and developing your own ideas. So let me try and awaken the book-worm in you.

If you have never spent a lazy monsoon afternoon lying in bed, reading..then maybe this piece of writing will inspire you to do just that. So first things first. How do you develop this habit of reading? I may have a few tips and tricks for you. Firstly, carry a book wherever you go. (Life has been made much easier for us now, since digital versions of books can be accessed from our beloved phones). Secondly, start by reading short books of a genre that interests you. Thirdly, read before sleeping. Lastly, reduce time spent on social media and devote that to reading books.

If this article is inspiring you to read, then you must be given a reading-list. So, here are some of my favourite books that may nudge you to break up with your beloved phone (even if for a brief while) and engage in a brand new love story with books.

1. Sapiens: A Brief History of Humankind by Yuval Noah Harari: Reading this book is like going through an old black and white photo album of your family. Harari documents the numerous evolutions Homo sapiens has undergone over the last 70,000 years. This book is also available in a beautifully illustrated graphic version.

2. The Little Prince (Le Petit Prince) by Antoine de Saint-Exupéry: This is a quick read and may come across as a children's book but is most definitely for adult readers—reminding them about what counts and what does not count in life.

3. Persepolis: The Story of a Childhood by Marjane Satrapi: An edgy, candid and searingly observant account of the political and cultural evolution of Iran, through the eyes of a little girl. This graphic novel reiterates the belief that the personal is always political.

4. The Curious Incident of the Dog in the Night-Time by Mark Haddon: This is a murder mystery with a difference. An autistic boy tries to solve a murder mystery and through his observations and obsessions we begin to question how normal is the term 'normal'?

5. The Colour Purple by Alice Walker: This powerful book is a serious read, breaking the silence that surrounds domestic violence. This book is a must read as it teaches us about resilience and companionship.

Hoping that you develop a committed, endearing and everlasting relationship with books. Read, read and read some more because in the end we will all become stories!

বানগড়ের ইতিকথা

সুদর্শনা সরকার

(সহকারী অধ্যাপিকা, অর্থনীতি বিভাগ)

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুরের নিকট পূণর্ভবা নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত ঐতিহাসিক বাণগড় প্রত্নস্থলটি ইতিহাসপ্রেমী সুধিজন ও প্রত্নতত্ত্ববিদদের নিকট অতি সুপরিচিত। অসুররাজ বাণাসুরের নামাঙ্কিত ঐ প্রত্নক্ষেত্রটি মৌর্য, শুঙ্গ, কুষাণ, গুপ্ত, পাল ও পরবর্তী যুগে নানা নামে পরিচিত ছিল। উল্লেখযোগ্য কটি নাম হল দেবীকোট, কোটিবর্য, উযাবন, উমাবন, বাণপুর, শোণিতপুর ইত্যাদি। মৌর্য সময়কালীন মহাস্থান শিলালেখতে কোটীবর্ষের কথা উল্লেখ আছে। নানান ঐতিহাসিক প্রমাণ থেকে বোঝা যায় মৌর্য ও মৌর্যোত্তর যুগে বাণগড়ের কি বিশাল গুরুত্ব ছিল। তবে পালযুগে এটির বিশেষ রমরমা ছিল। কাহিনি-কিম্বদন্তীর অন্যতম কেন্দ্র বাণগড়ের গুরুত্ব ঐতিহাসিক, গবেষক ও প্রত্নানুসন্ধানীরা অনুমান করে ক্ষেত্রানুসন্ধান করেছেন এবং তাদের প্রতিবেদন লিপিবদ্ধ করেছেন। এঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন বুখানন হ্যামিল্টন ও আলেকজান্ডার কানিংহাম। তাঁদের বর্ণনার সাথে বর্তমানের বাণগড়ের পুরোপুরি মেলানো না গেলেও অনেকটাই মেলানো যায়। দুর্গপ্রাকার পরিবৃত দুর্গাভ্যন্তরে ও প্রাকার ও পরিখার বাইরে বর্তমান রাজীবপুর গ্রামের প্রায় সবটা জুড়ে রয়েছে প্রাচীন কোটীবর্ষের ধ্বংসাবশেষ। কালের ও মানুষের নখরাঘাতে বাণগড় অনেকটাই ক্ষতিগ্রস্থ। তথাপি বাণগড় তার বুকে যা সঞ্চয় করে রেখেছে তা প্রত্নতত্ত্ববিদদের কাছে খনির মতো। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে ড: কে. জি. গোস্বামী ১৯৩৮-৪১ এখানে উৎখনন করেছিলেন এবং মৌর্যযুগ থেকে ঐস্লামিক যুগ অব্দি বিভিন্ন সংস্কৃতির নিদর্শন পেয়েছিলেন। তাঁর আবিষ্কার কাহিনি-কিম্বদন্তীর বাণগড়কে একটি ঐতিহাসিক মাত্রা দিয়েছিল। পরবর্তীকালে পাটনার ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের উৎখনন শাখা এখানে একটি সীমিত উৎখনন করেন। তাঁদের আবিষ্কৃত তথ্য ও কে. জি. গোস্বামীর তথ্যের অনুরূপ। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের কলকাতা মন্ডল অতি সম্প্রতি উৎখনন পরিচালনা করেছেন বাণগড়ে এবং আবিষ্কৃত তথ্যাদি হল নিম্নরূপ :

Archaeological Ruins of Bangarh

উৎখনন খুব একটা বিশাল আকারের করা হয়নি। কিন্তু ফলাফল গুরুত্বপূর্ণ। পরিখা ও দূর্গপ্রকার পরিবেষ্টিত প্রাচীন নগর এলাকার সবথেকে উঁচু জায়গায় খনন শুরু হয়েছিল 'গ্রিড' পদ্ধতিতে। সর্বাধিক

১০.৭৫ মি: অবধি গভীর খনন পরিচালিত হয় প্রাগমৌর্যযুগ থেকে মুঘল যুগ অবধি সাংস্কৃতিক অধিবসতির স্তর উন্মোচিত হয়েছে। প্রাগমৌর্যযুগের লোকেরা নলখাগড়ার উপর মাটির প্রলেপ দেওয়া বাড়িতে বসবাস করত। এই পূর্বের আবিষ্কৃত অন্য বস্তুগুলি হল নানারকম পুঁতি, একটি ক্ষুদ্র নৌকা এবং কৃষ্ণ-প্রলেপ

দেওয়া পোড়ামাটির পাত্র, কৃষ্ণ-লোহিত, ধূসর ও লালরঙের পোড়ামাটির পাত্র। নিম্নস্তর থেকে জল চোয়ানোর কারণে এর তলদেশে আর খোদাই সম্ভবপর হয়নি। মৌর্যযুগের আবিষ্কৃত প্রত্ননিদর্শনগুলি হল একটা ছোটো পোড়ামাটির বেড় দেওয়া কুঁয়ো। বড়ো ইটের তৈরি একটি দেওয়াল, অঙ্ক চিহ্নিত মুদ্রা, পোড়ামাটির খেলনা পুতুল, পুঁতি ইত্যাদি। পূর্ববর্তী যুগের কৃষ্ণ প্রলেপের নানান পাত্রাংশ ছাড়াও লাল ও হালকা ধূসর কিছু পোড়ামাটির পাত্র পাওয়া গেছে।

শুঙ্গ-কুষাণ যুগেও একটি ইটের তৈরি দেওয়াল পাওয়া গেছে। সাথে পাওয়া গেছে অনেক পোড়ামাটির টালি। ঐ যুগে প্রাপ্ত অন্যান্য প্রত্নবস্তুগুলি হল লিপিবিহীন ঢালাই করা মুদ্রা, ছটি ছাপওয়ালা পোড়ামাটির গোলাকার তাল, পোড়ামাটির নানান ফলক, যক্ষী, জীবজন্তু, তামার চুড়ি, কাজল-শলাকা ইত্যাদি। কতগুলি চিহ্ন সমন্বিত একটি একটি পোড়ামাটির আঙটি এ যুগের অন্যতম আবিষ্কার। লালা, ধূসর ও কৃষ্ণ-লোহিত পোড়ামাটির পাত্রাংশ এই স্তরে পাওয়া গেছে। গুপ্ত অধিবসতি স্তরে ভাঙা ও গোটা ইটের তৈরি গৃহের অংশ বিশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। একটি পোড়ামাটির বেড়-ওয়ালা কুঁয়ো এ যুগের অন্যতম আবিষ্কার। গুরুত্বপূর্ণ আর একটি আবিষ্কার হল পোড়ামাটির মেঝে। সম্ভবতঃ ভারতবর্ষে অন্যকোথাও ঐ রকম মেঝে পাওয়া যায়নি। ঐ পর্বে প্রাপ্ত অন্যান্য প্রত্নবস্তুগুলি হল নানারকম পুঁতি, পোড়ামাটির নানান জীবজন্তু, ফলক, মূর্ত্তি, ছিপি জাতীয় বস্তু, একটি সুন্দর পোড়ামাটির ছাঁচ যাতে একটি পুরুষ মূর্ত্তি উৎকীর্ণ আছে যে দু-হাতে দুটি জন্তুকে ধরে আছে। একটি সীল পাওয়া গেছে যাতে শঙ্খের মতো কোনো নক্‌সা খোদাই করা আছে। পোড়ামাটির পাত্রাদি হল মূলতঃ লাল

এবং ধূসর রঙের। বাটি, কলস, নলযুক্ত জারের মতো পাত্র লোকেরা ব্যবহার করত। হাতল যুক্ত কড়া, গভীর থালাও তারা ব্যবহার করত। গুপ্তোত্তর যুগে আবিষ্কৃত হয়েছে ভগ্ন ও আস্ত ইটের তৈরি একটি বসতগৃহের অংশ। এই গৃহের সংলগ্ন অলিন্দ ও ক্ষুদ্র প্রাঙ্গনও আবিষ্কৃত হয়েছে বিভিন্ন উচ্চতায়। এই সময়ে বেশ কয়েকবার ব্যাপক অগ্নিকান্ড ঘটেছিল। উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য নিদর্শন না পাওয়া গেলেও পোড়ামাটির খেলনা-চাকতি, নানান মাটির ছিপি, পুঁতি ইত্যাদি পাওয়া গেছে। ঐ যুগের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হল একটি জীব-মনুষ্যাকৃতি ধর্মীয় মূর্ত্তি (পোড়ামাটির) যেটিকে বিভিন্ন দিক থেকে দেখলে কচ্ছপ, পাখি, ডানাওয়ালা মানুষ এবং অবশ্য লজ্জা-গৌরীর আদল দেখা যায়। ঐ রকম বিচিত্র বহুমুখী

মূর্ত্তি বিরল। পালযুগের বহু নিদর্শন অধ্যাপক কে. জি. গোস্বামী খনন করে বার করেছিলেন। বর্ত্তমান

উৎখননে আবিষ্কৃত হয়েছে দক্ষিণ দিকের দুর্গ প্রাকারের উপর দুটি অর্ধবৃত্তাকার নজরদারিস্তম্ভ। এরকম আরো দশ-বারোটি স্তম্ভের অস্তিত্ব প্রাথমিকভাবে লক্ষ্য করা গেছে। বুরুজাকৃতি নজরদারি স্তম্ভগুলি ওপরের দিকে ক্রমশঃ সরু হয়ে গেছে। এই যুগে প্রাপ্ত অন্য প্রত্নবস্তুগুলি হল পঞ্জের তৈরি ক্ষুদ্র নৌকা, পোড়ামাটির জীবজন্তু ও মুনষ্য মূর্ত্তি, হাড়ের তৈরি চুলের কাঁটা, নানারকম পুঁতি ইত্যাদি। লাল ও ধূসর রঙের অনেক পোড়ামাটির পাত্রাংশও পাওয়া গেছে।

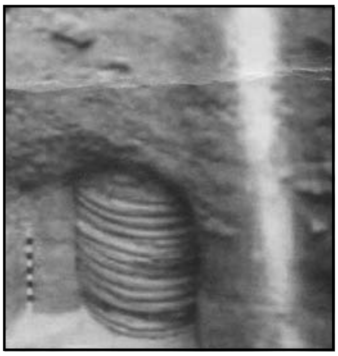

সুলতানি আমলে সম্ভবতঃ এই দুর্গপ্রাকারগুলির উপর নির্মিত বুরুজাকৃতি নজরদারি স্তম্ভগুলির সংস্কার সাধন হয়েছিল। একটিকে বাঁচানোর জন্য সুরক্ষা দেওয়ালও তৈরি করা হয়েছিল বলে অনুমান। দুর্গপ্রাকারের উপরের দিকে যে অস্থায়ী মেঝেও দেওয়ালগুলি আছে তা সম্ভবতঃ এই যুগের। এনামেল করা ইটের টুকরো ও বাসনকোসনের টুকরোও পাওয়া গেছে। পরবর্ত্তী যুগেও এখানে সাময়িক বসবাস হয়েছিল বলে অনুমান।

বাণগড় কেন্দ্রিক অন্যান্য পুরাকেন্দ্রগুলি :

এই অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্নভাবে ছিড়িয়ে ছিটিয়ে আছে নানান পুরাতাত্ত্বিক জিজ্ঞাসা স্থল। সে সবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঊষা-অনিরুদ্ধের বিবাহবাসর, কালদিঘি, ধলদিঘি, বিরুপাক্ষ, শিবমন্দির, দেবীকোট, বৌদ্ধবিহার, ঊষাতিটি, জিয়নকূপ, মরণ-কূপ, বখতিয়ারের সমাধি, কালাপাহাড়, কর্তৃক ধ্বংসপ্রাপ্ত ভাইওয়ের মায়ের থান নামে পরিচিত প্রাচীন কালী মন্দির, ভিকাহারের মন্দিরবাসিনী বামাকালী মন্দির প্রভৃতি স্থান উল্লেখযোগ্য। পর্যটন মানচিত্রে বাণগড়কে তুলে ধরতে সংক্ষেপে সে সবের কিছু পরিচয় তুলে ধরেছি।

ঊষা অনিরুদ্ধের বিবাহ মন্ডপ :

পুরাণে ঊষা-অনিরুদ্ধের প্রেমকাহিনি বিবৃত আছে। বিবৃত আছে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নিজ দৌহিত্র অনিরুদ্ধকে দূত হিসাবে বাণরাজার কাছে প্রেরণের কথা। দৌত্যগিরি করতে এসে অনিরুদ্ধ বাণরাজার সুন্দরী কন্যা ঊষার প্রণয়াসক্ত হন এবং তাকে হরণ করে নিয়ে যান। এলাকায় ঊষা-হরণ রোড বলে একটি স্থান আজও স্বমহিমায় আছে। লোকশ্রুতি, এই বিবাহ মন্ডপেই ঊষা-অনিরুদ্ধের বিবাহ হয়েছিল। সেই বিবাহ মন্ডপটি আজও বিদ্যমান। পর্যটকরা আজও এই মন্ডপ দর্শনে আসেন।

জিয়ন কূপ :

ঊষা-অনিরুদ্ধের বিবাহ মন্ডপ বলে কথিত স্থানটির পূর্ব-দিকে মূল বাণগড়ের প্রাসাদ থেকে পূর্ব দিকে জিয়ন কূপ বলে কথিত একটি পুকুর আছে। পুকুরটির আয়তন বেশ বড়ো এবং গভীর। লোকশ্রুতি আছে যে, সর্পদংশনে বা যুদ্ধে আহত রোগীদের জলে নিক্ষেপ করা হতো, যাতে করে স্তব্ধ বা আহত সৈনিকরা জলের সংস্পর্শে এসে পুনর্জীবন ফিরে পায়। বাণরাজার প্রাসাদেও আছে এমন একটি জিয়ন কূপ।

মরণ কূপ :

অনুরূপভাবে বিশেষ যে কূপ বা পুকুরে নিক্ষেপ করে শত্রুসৈন্য বা মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্তদের মৃত্যু দেওয়া হতো, সেই কূপকে মরণ কূপ বলে। অনুমেয় এইসব কূপের জলে বিষ মেশানো থাকতো, যাতে জলে নিক্ষেপ করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মৃত্যু হয়।

কালদিঘি :

সুয়োরানী-দুয়োরানী, কলোরানী-ধলোরানী ঠাকুরমার ঝুলির উপাদান। বাণরাজার কালিণি কিংবদন্তীতেও

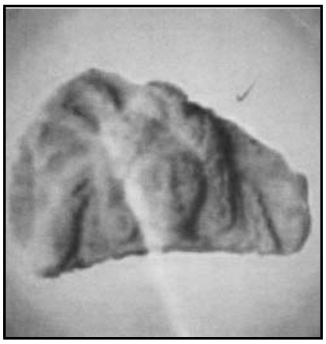

উল্লেখ আছে কালোরানী-ধলোরানীর নাম। শুধু উল্লেখই নয় কালোরানীর নামে কালদিঘি ও ধলোরানীর নামে ধলদিঘি আজও বিরাজমান। বাণরাজার প্রাসাদ থেকে এক কিলোমিটার দক্ষিণে, দিঘি দুটি পাশাপাশি অবস্থিত। গঙ্গারামপুর থানার রাজীবপুর ও রঘুনাথবাটি মৌজার অন্তর্গত পঁচাশি একর জলাশয়ের উত্তর-দক্ষিণ লম্বা বিশাল দিঘিটি কালদিঘি নামে পরিচিত। এর চারপাশের উঁচু পাড়ের ক্ষেত্রফল ৪.৪ বর্গকিলোমিটার। দিঘিটি বর্তমানে জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রাধীন।

ধলদিঘি :

কালদিঘি থেকে একশো মিটার পশ্চিমে পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা ধলদিঘি। লোকশ্রুতি বাণ রাজা তাঁর ধলোরানীর জন্য এই দিঘি খনন করেছিলেন। ৬৫ একরের এই দিঘি চারপাশের ক্ষেত্রফল চার কিলোমিটার। জনশ্রুতি, বৌদ্ধপন্ডিত, অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তিব্বত যাত্রা কালে এই বিহারে কিছুকাল অবস্থান করেছিলেন। মুসলিম আক্রমণে বিহারটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ধ্বংসপ্রাপ্ত বিহারের ওপর জনৈক আতাউল্লাশাহ ফকির নামে পীরের মাজার গড়ে উঠেছে।

অতীশ দীপঙ্করের স্মৃতি বিজড়িত দেবীকোট বৌদ্ধবিহার ও আতাশার বাণরাজার ধলোরাণীর নামাঙ্কিত ধলদিঘির পাড়ে প্রাচীন দেবীকোট বৌদ্ধবিহার গড়ে উঠেছিল। বাঙলায় অন্য অনেক বৌদ্ধবিহারের মতোই এই বৌদ্ধবিহারটি পাল-বৌদ্ধ যুগে বাণগড় তথা বাঙলার গৌরব ছিল। এখানে বরেন্দ্রভূমিসহ সমগ্র বাঙলা, ভারত, তিব্বত ও চীন থেকেও বিদ্যার্থীরা বিদ্যা অর্জন করতে আসতেন। জনশ্রুতি এই যে ঢাকা

বিক্রমমণিপুরের বিখ্যাত বৌদ্ধ পন্ডিত অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান এই বৌদ্ধ বিহারে কিছুকাল অবস্থান করেছিলেন।

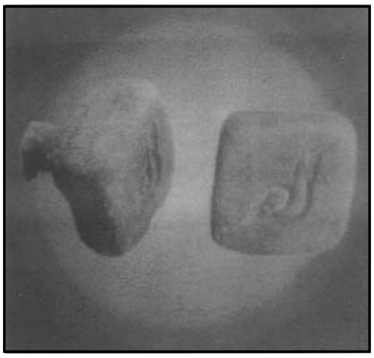

ঊষা তিটি বা ঊষা গড় :

বাণরাজার প্রাসাদ থেকে এক কিলোমিটার উত্তরে বাণরাজার বিরূপাক্ষ শিব মন্দিরটিও পূনর্ভবা নদীটির বাম তীরে অবস্থিত। এই পূনর্ভবা নদীর ডান তীরে দেবীপুর নামক গ্রামে অবস্থিত এই ঊষা তিটি বা ঊষা গড়। এই গড়ে এখনো খননকার্য শুরু হয়নি। এই গড়েই শ্রীকৃষ্ণের দৌহিত্র অনিরুদ্ধ ও তাঁর স্ত্রী বাণরাজার কন্যা ঊষা কিছু সময় ধরে বসবাস করতেন। পরবর্তীকালে যে পথে ঊষাকে নিয়ে দ্বারকার পথে অনিরুদ্ধ পালিয়ে ছিলেন সে পথটি এখনো ঊষা হরণ রোড নামে পরিচিত। এই ঊষা-অনিরুদ্ধের স্বল্পকালীন গন্ধব বিবাহিত জীবনের বাস যে গৃহটিতে হয়েছিল সেই গৃহটির ধ্বংসাপ্রাপ্ত ঢিবিকেই লোকে 'ঊষা তিঠি' বা ঊষা-অনিরুদ্ধের বিবাহ বাসর বলে মনে করে। গঙ্গারামপুর হাইস্কুলের দক্ষিণদিকে বড়ো একটি পুকুরের উত্তর পাড়ে অবস্থিত লম্বাকৃতি জৈন শিবমন্দির।

বর্তমান উৎখনন থেকে প্রাপ্ত নিদর্শনাদি থেকে অনুমান করা যায় যে বাণগড়ে বহুদিন ধরে লোকজন বসবাস করেছিল। প্রাপ্ত স্থাপত্য ও অন্যান্য প্রত্ন নিদর্শনের আরো বিশদ গবেষণা হবে। গবেষণার নিরীখে কালানুপঞ্জীর হয়তো পরিবর্ত্তন হতে পারে কিন্তু যে বস্তুগত সংস্কৃতির নিদর্শন পাওয়া গেছে তাতে আজ থেকে প্রায় ২৫০০ বছরের পুরোনো এক জনপদের অস্তিত্বকে কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না।

শরৎচন্দ্র, এখনও একইরকম

ড. উত্তরা কুণ্ডু চৌধুরী
(শিক্ষিকা, বাংলা বিভাগ)

মাটির দাওয়ায় এখনও অন্নদাদিদি বসে
থাকে ইন্দ্রনাথের প্রতীক্ষায়,
আজো আমাদের
বাড়ির পাশে আঁচলের খুটে গোপন
অশ্রু মুছে নেয় অভয়া আর রাজলক্ষী,
এখনও গাছের নীচে পড়ে থাকে
মৃতপ্রায় দেবদাস।
শরৎবাবু, সবই এখনও একইরকম আছে
শুধু শতসহস্র ঘূণপোকা তোমার
বইয়ের পাতাগুলো ছিঁড়ে নিয়েছে
আপন স্বার্থে—
শরৎবাবু, এই নাও ডটপেন
তুমি আবার লেখো অচলার কথা,
মেজদিদি আর শ্রীকান্তের কথা—
আমাদের চোখের জলে আবার
সিক্ত হোক বাংলার লালমাটি।

আর্তি

ড. শর্মিষ্ঠা মিত্র
(শিক্ষিকা, দর্শন বিভাগ)

প্রকৃতি! আমি ঋণী তোমার কাছে,
তুমি আমাকে দিয়েছ প্রাণ, দিয়েছ
দেহ। তোমারই রং নিয়ে আমার মন
কখনও হয়ে উঠেছে সবুজের
তারুণ্যে ভরপুর। আবার কখনও
হালকা নীলচে ঔদার্য বিতরণ করেছে
জগতময়। তোমারই রুক্ষতা ধার করে
সে ও রুক্ষ হয়েছে কারো কারো প্রতি।

তোমার আনন্দ, ভালোবাসা আর পবিত্রতা
যখন একাকার হয়েছে আমার মধ্যে
তখনই তো গেয়ে উঠেছি গান, লিখেছি
কবিতা। আমি পরিণত হয়েছি একটু
একটু করে, তুমি পরিণত করেছ আমায়।
আমার কাব্য শিল্প সাহিত্য বিজ্ঞান
জীবনবোধ রুচির আবরণ আবর্তিত হয়েছে
তোমাকেই ঘিরে, তুমি জননী, শিক্ষিকা, বান্ধবী।

প্রকৃতি! আমি লজ্জিত তোমার কাছে,
আমি মানুষ! চির স্বার্থপর, চিরলোভী
চির কলুষময় আমার জীবন, যা আমি
বহন করছি এবং সঞ্চারিত করব আগামী প্রজন্মে।
বারবার তোমারই দয়ার দানে হয়ে উঠব আরো
উদ্ধত, ঈর্ষাপরায়ণ, তোমার কাছেই অস্ত্রশিক্ষা
করে চিরে ফেলব তোমারই বুক। তোমার উদারতা
দিয়ে তুমি মানবকে ক্ষমা কোরো। প্রকৃতি!

শিশু উৎসব

মনোলীনা শেঠ
(শিক্ষিকা, সমাজতত্ত্ব বিভাগ)

ভোর ছুঁয়ে চোখের পাতা
রাত্রি নামে ঠোঁটে,
অনেক ঘামের বিনিময়ে
দু-মুঠো ভাত জোটে।

বোঝাই ইটের মধ্যিখানে
একফালি চাঁদ উঁকি,
বুধন-রশিদ এগিয়ে চলে
সাথী জীবনের ঝুঁকি।

কবে কখন ঘর ছেড়েছে,
কেমন কাটে দিন,
নীরব শ্রমে মিটিয়ে চলে
পরিবারের ঋণ।

দূর পাহাড়ের গায়ে ছিল
বুধন থাপার বাড়ি,
গাঁয়ের স্কুলটা মনে পড়লে
নিষ্পাপ চোখ ভারী।

ঝাপসা লাগে ঈদের চাঁদ
জহর গরম ভাত
বছর ঘুরল আব্বা, রশিদ
হয়নি মোলাকাৎ।

বাপ মরলো অকাল রোগে,
জীবন গেল ঘুরে,
রতনের মা কাটাল মায়া,
মহালয়ার ভোরে।

শারদ সকাল নতুন জামা
গাঁয়ের মাঠে ঢাক,
অনাথ রতন পুজোর ভিড়ে
আবার ফিরে যাক।

এগিয়ে চলে ওদের সময়
মাথায় ইটের বোঝা,
কাজের ফাঁকে অষ্টপ্রহর
নতুন জীবন খোঁজা।

খাটনি শেষে ক্লান্ত দেহে
বুধন-রশিদ-রতন,
আড্ডা-গল্পে সব বাজিমাত
সন্ধ্যা নামে যখন।

উৎসব যায় কাজের ভারে
ঘুরেও আসে আবার,
রতন-বুধন-কৃষ্ণ-রশিদ
উৎসব হোক সবার।।

বাংলা নাটক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার প্রসঙ্গে মনোজ মিত্রের নাটক 'চাক ভাঙা মধু' এবং 'সাজানো বাগান'

ভবানী কর
(শিক্ষিকা, বাংলা বিভাগ)

বাংলা নাটকের ঐতিহ্য শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের, বাংলা নাটকের ঐহিত্য লড়াইয়ের, বাংলা নাটকের ঐতিহ্য সংগ্রাম ও আন্দোলনের। 'বাংলা নাটকের ঐতিহ্য' একথা বলতে গেলেই প্রথমেই বলতে হয় বাংলা নাটকের পরম্পরার কথা। প্রথম বাংলা নাট্যমঞ্চ নির্মাণ করেন রুশ মণীষী হেরাশিম লেবেদফ, তিনিই 'বেঙ্গলী থিয়েটার' স্থাপন করেন ১৭৯৫ খ্রিষ্টাব্দে এবং ২৭শে নভেম্বর 'সংবদল' নামক একটি নাটক মঞ্চস্থ করেন। তারপর এই ঐতিহ্য প্রকাশ পায় একের পর এক নাট্যব্যক্তিত্বের নাটকে, তাদের মধ্যে হরচন্দ্র ঘোষ, রামনারায়ণ তর্করত্ন, মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, বিজন ভট্টাচার্য, বিমল রায়, উৎপল দত্ত, সুবিনয় রায়, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজ মিত্র, সৌমিত্র বসু, শাঁওলী মিত্র, ব্রাত্য বসু, আরও অনেকে লিখেছেন। হরচন্দ্র ঘোষের—'ভানুমতী চিত্তবিলাস', রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব', মাইকেল মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী', দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রক্তকরবী', গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'জনা', বিজন ভট্টাচার্য্যের 'নবান্ন', সলিল সেনের 'নতুন ইহুদী', মনোজ মিত্রের 'সাজানো বাগান', শাঁওলী মিত্রের 'নাথবতী অনাথবৎ', ব্রাত্য বসুর 'মীরজাফর' ইত্যাদি অনেক উল্লেখযোগ্য নাটকে সেই ঐতিহ্য প্রকাশ পেয়েছে। প্রতিবাদ, প্রতিরোধের ভাষা যুগিয়েছে বাংলা নাটক। বাংলা নাটকেই প্রতিফলিত হয়েছে সমকালীন জীবন, সমাজ, রাজনীতির চিত্র। বাংলা নাটকেই বিভিন্ন জাতীয় আন্দোলনের প্রবাহ ফুটে উঠেছে। বাংলা নাটকের ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার সমকালীন সমাজ জীবন, রাজনৈতিক জীবনের মধ্যে দিয়ে যে ধারায় ফুটে উঠেছে নাট্যব্যক্তিত্ব মনোজ মিত্রের নাটক সাজানো বাগান, চাক ভাঙা মধু নাটকেও তা স্পষ্ট। নাট্যকার মনোজ মিত্র ২২শে ডিসেম্বর ১৯৩৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন, বিভাগপূর্ব বাংলার (বাংলাদেশ) খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার একটি গ্রামে। তিনি ভারত ভাগের পর পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। বাংলা নাটক নিয়ে আলোচনায় বিশিষ্ট নাট্যকার মনোজ মিত্রের নাটক 'চাক ভাঙা মধু' এবং 'সাজানো বাগান' নিয়ে আলোচনা করা হল—

চাক ভাঙা মধু :

নাট্যকার মনোজ মিত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক 'চাক ভাঙা মধু' (১৯৬৯) স্বাধীনতার দুদশক পর নাটকটি রচিত হয়। মনোজ মিত্র যে সময় পর্বে এই নাটক লেখেন তখন নকশাল আন্দোলন হয়ে গেছে। রাজ্য জুড়ে খাদ্য আন্দোলন (১৯৫৯) শহীদ হন ৮১ জন কৃষক। ১৯৬২তে সমাজে একধরনের নতুন শ্রেণির জোতদার আর্বিভাব হয়—এরাই মহাজন, এরাই মজুতদার, এরাই কালোবাজারি করে। ভারত রক্ষা আইন

চালু হওয়ার ফলে এদের আবির্ভাব হয়। সৃষ্টি হয় খাদ্য আন্দোলন (১৯৬৯)। যার ফলে গ্রাম নগরে সংগ্রাম চোখে পড়ে। এই সংগ্রামের ছায়াতেই নাট্যকার মনোজ মিত্র লেখেন 'চাক ভাঙা মধু' নাটকটি। এটি ১৯৬৯ সালে লেখা হলেও পুনরায় ১৯৭১ সালে লেখা হয় নাটকটি। নাটকটি সুন্দরবন অঞ্চলের কোনো এক প্রত্যন্ত গ্রামের পটভূমিকায় লেখা। নাটকটি দুটি অঙ্কে বিন্যস্ত শোষক ও শোষিতের প্রতিবাদী ভাবনায় শোষণের অবসান। শ্রেণিবিভক্ত মানব সমাজে দ্বন্দ্ব চিরকালীন বিষয়। এই দ্বন্দ্বের পথ ধরেই আসে প্রতিরোধ, গর্জে ওঠে মানুষ, তখনই মানুষ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এমন এক পটভূমির রচনা 'চাক ভাঙা মধু'। এ নাটকে বলিষ্ঠ জীবন যন্ত্রণা যেমন ফুটে উঠেছে, তেমনই ফুটে উঠেছে নির্মম বেদনার ছবি। সমাজে মহাজনের নির্দয় বঞ্চনায় একেবারে নিঃস্ব একটি গ্রাম। ক্ষুধায়, যন্ত্রণায় শোষিতরা হাহাকার করে এই নাটকে। আমরা দেখি অঘোর ঘোষের কারণে ওঝা পরিবারে নেমে আসে যন্ত্রণা। বাদামি সন্তানসম্ভবা হওয়ায় সে ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য করতে পারে না এমন সময় সে পেটের সন্তানের মৃত্যু কামনা করে। নাটকের উল্লেখযোগ্য এক চরিত্র হল জটা তাদের দুবেলা দুমুঠো অন্ন নেই, মাথার ওপর ছাদ নেই, এসব থেকে তারা বঞ্চিত। মনোজ মিত্রের এই সমস্ত নাটকেই তাঁর শৈল্পিক নিদর্শন ফুটে উঠেছে। নাট্যকার মনোজ মিত্র দেখিয়েছেন এই সমস্ত মানুষরা তাদের প্রাপ্য থেকে কতটা বঞ্চিত, কতটা অসহায় তারা, শোষক শ্রেণির করাল গ্রাসে তারা যে বিলীন হতে চলেছে তারই দৃশ্য এঁকেছেন নাট্যকার মনোজ মিত্র। নাটকে দেখি ভয়ঙ্কর ক্ষুধায় মাতলা সাপ পুড়িয়ে খেতে চায়। মহাজন অঘোর ঘোষের অত্যাচারেই তার এই পরিণতি। দেখা যায় সমাজের মহাজন ও সুদখোর শ্রেণি সমাজের খেটে খাওয়া অন্ত্যজ শ্রেণির আতঙ্কের কারণ হয়ে থাকে। অভাবে যে সুদখোর শ্রেণি টাকা ধার দেয় পরিশেষে সবকিছু গ্রাস করেও পাওনা মেটে না। ফলে সমাজের শোষক শ্রেণির প্রতি সাধারণ শ্রেণির মানুষের কোনও সম্মান, কোনও সহানুভূতি থাকে না। 'চাক ভাঙা মধু' নাটকে সুদখোর চরিত্র হল অঘোর ঘোষ। সাপে কাটলে বিষ ঝাড়ার জন্য প্রয়োজন হয় সাপুরে শ্রেণির। চাষের জমি, স্থাবর সম্পত্তি হারিয়ে দরিদ্র শ্রেণির মানুষগুলো চাষের হাত থেকে মুক্তি পায়নি। তারা অঘোর ঘোষের চিকিৎসা না করার মতলব করে কিন্তু বাদামী গর্ভবতী মেয়েটা বাধা দেয়। শঙ্করের ভদ্রোচিত আত্মসমর্পণের জন্য বাদামী তার চিকিৎসার ভার নেয় কিন্তু অঘোর ও তার ছেলে শঙ্কর, বাদামী ও মাতলাদের মতো মানুষ গুলোর বিশ্বাস ভেঙে আবার শোষক হয়ে ওঠে। বাদামীকে নিয়ে যেতে চায় নিজের লালসাকে চরিতার্থ করার জন্য। বাদামী যায় বটে কিন্তু প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য উন্মুখ থাকে। বাদামী তার বাবার আনা গোক্ষুর সাপ যেটা তার বাবা একদিন বাদামীকে 'চাক ভাঙা মধু' বলে ছলনা করেছিল সেটি সঙ্গে নেয়। কিন্তু বাদামীর বাবা মেয়ের নিরাপত্তা কামনায় সাপটাকে মেরে ফেলে। বাদামী জানে না যে কলসীটা ফাঁকা তাই সে ব্যর্থ হয় সে যাত্রায় কিন্তু পরিশেষে বাদামী সড়কি দিয়ে অঘোর ঘোষকে হত্যা করল। পাঠকও তৃপ্ত হয় নাটক পাঠ করে। নাটকের পরিণতি সবচেয়ে আকর্ষণীয়। এখানেই নাট্যকার মনোজ মিত্রের সৃষ্টি সাফল্য।

সাজানো বাগান :

এই নাটকটি ১৯৭৬ সালে রচনা করেন নাট্যকার মনোজ মিত্র। নাটকটির কাহিনি শুরু হয়েছে এক বৃদ্ধ কে নিয়ে তার নাম বাঞ্ছারাম। বাগানকে নিয়ে তার যত স্বপ্ন। নাট্যকার মনোজ মিত্রের নাটক 'সাজানো বাগান' ও চলচ্চিত্র বাঞ্ছারামের বাগান দুটিতেই বাঞ্ছারাম চরিত্র শিল্প সাফল্য পেয়েছে। তুলনামূলক আলোচনা ও বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণের মাধ্যমে আলোচনায় সাজানো বাগান ও বাঞ্ছারামের বাগানকে একই দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখা হয়েছে। বাঞ্ছার সঙ্গে থাকে তার ছোটো মেয়ের ছেলে গুপি। গুপির বাগানের প্রতি কোনও মায়া নেই এটাই বাঞ্ছারামের অসহ্য লাগে। বাঞ্ছারামের বাগানে প্রতিদিনই চোরের উৎপাত। এদিকে জমিদার ন'কড়ির বাবা বাঞ্ছারামের বাগান দখল করতে চেয়েছিল, তিনি মারা যাওয়ার পরে তার ছেলে নকড়ি দত্ত বাগান নিতে চায়। চোরও তা চায় না, কারণ চোর সেই বাগান থেকে নিত্য কলা মুলো চুরি করতে পারত, জমিদার বাগান দখল করলে চোরও তা পাবে না। এই নাটকে চোর এর প্রসঙ্গতেই বোঝা যায় তৎকালীন সমাজে অর্থনৈতিক রূপরেখা। চোরের জীবন জীবিকা নির্বাহ হয় বাঞ্ছারামের বাগানের ফল চুরি করে। ন'কড়ির গুপির সঙ্গে বোঝাপড়া করে বাঞ্ছারামের টিপসই নিতে চায়, কিন্তু বাঞ্ছারাম রাজি হয় না। অবশেষে বাঞ্ছারাম ছাপ্পান্ন হাজার টাকায় বিক্রি করতে রাজি হয়, কিন্তু একটি শর্ত রাখে যতদিন বাঁচবে বাগান তার। ন'কড়ি কে মাসের প্রথমে দুশো টাকা করে দিতে হয়। ন'কড়ি ভেবেছিল বাঞ্ছারাম বেশিদিন বাঁচবে না। কিন্তু নাতবৌ এর আদর যত্নে বাঞ্ছা সোজা হয়ে হাঁটে। জমিদারের এইরকম মানসিকতাই নাটকে তৎকালীন সমাজের জমিদারদের দরিদ্রদের শোষণ করার ছবি প্রকাশ করে। অবশেষে নাতবৌ এর বাচ্চা হলে বাঞ্ছা তাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখে এবং ন'কড়িকে জানায় সে মড়তে পারবে না। কারণ বাচ্চাটার প্রতি তার মায়া পড়ে গেছে। নাটকের শেষে নকড়ি মারা যায় কিন্তু বাঞ্ছারাম সোজা হয়ে হাঁটে সাজানো সংসারের সুখে। এই নাটকে বাঞ্ছারাম শুধু লড়াকু কোনো চরিত্র নয়, নতুন প্রাণের সান্নিধ্যে জীবন যুদ্ধে জয়ী এক মানুষের চরিত্র বাঞ্ছারাম। এই নাটকে বাঞ্ছারাম, চোর, পদ্ম, গুপি চরিত্রে সমাজের একেবারে সাধারণ মানুষের চরিত্র ফুটে উঠেছে। বাঞ্ছারাম বেঁচে থাকলেই এই মানুষগুলো বেঁচে থাকতে পারবে। 'সাজানো বাগান' নাটকে সমাজের বিত্তবান শ্রেণির লোভ লালসার কুৎসিত চিত্রটাকে সুচারুরূপে তুলে ধরেছেন নাট্যব্যক্তিত্ব মনোজ মিত্র। সমকালীন সমাজের বিভিন্ন চিত্র ফুটে উঠেছে নাটকটিতে। ক্ষমতার অপব্যবহার, যুব সমাজের প্রকৃত মনুষ্যত্বের অভাব, চৌর্যবৃত্তি সমাজের প্রতিচ্ছবিগুলি এই নাটকে প্রতিফলিত হয়। ন'কড়ি বাঞ্ছারামবাবুকে বলে 'তুমি গত হলে এই ভিটেমাটি বাগান টাগান সব আমার হবে।' জোড় পূর্বক দলিলে সই করানোর চেষ্টা করেন তিনি বাঞ্ছারামবাবুকে দিয়ে। বৃদ্ধ বাঞ্ছারামের মৃত্যু ঘটেনি। শেষপর্যন্ত সাজানো বাগানে আকৃষ্ট হয়ে নকড়ি বাবুর মৃত্যু ঘটেছে নাটকটিতে। তবে বলা যায় নাট্যকার মনোজ মিত্র নাটকের আবহে প্রতিবাদী গণচেতনার স্বরূপ উদঘাটন করেছেন নানান ভাবে। নাট্যব্যক্তিত্ব মনোজ মিত্র প্রতিবাদী চেতনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন কখনও প্রতীকে, কখনও হাস্যকৌতুকের মাধ্যমে। নাটকের মধ্য দিয়ে বোঝা যায় নাট্যসাহিত্যের ধারায় আধুনিকতার এক নবরূপায়ণ এই নাটকটি।

সাজানো বাগান নাটকে শোষক শোষিতের দ্বন্দ্বের একটা প্যাটার্ন আছে কিন্তু তা কখনই বড়ো হয়ে ওঠেনি। সমসাময়িক বাংলা নাটক যখন বিদেশী নাটকের অনুবাদে মগ্ন তখন নাট্যকার মনোজ মিত্র সম্পূর্ণ দেশজ উপাদানে নির্মাণ করলেন দেশজ জীবনের উপভোগ্য দলিল 'সাজানো বাগান' নাটকটি। বাঞ্ছারাম অনেক লোভ স্বার্থপর মানুষের হাত থেকে তার বাগানকে বাঁচায়। নকড়িকে দিয়ে একাধিক প্রতিশ্রুতি পালন করিয়ে নেওয়া, এখানে বাঞ্ছারামের ধূর্ততা প্রকাশ পায়। বাগান থেকেই চুড়ি করা মুরগির ডিম যখন চোর বাঞ্ছারামকে খাওয়াতে যায় তখন স্বার্থপরতার দিক থেকে অসহায়তার দিকটিই বেশি প্রকাশ পায়। চোরের সহকর্মী হয় পাঠক বৃন্দ। সাজানো বাগান চিরকালীন নাটক। নাটকটিতে শ্রেণি সংগ্রাম ফুটে উঠেছে সেই সঙ্গে বাঁচার ও টিকে থাকার লড়াই দেখিয়েছেন নাট্যকার। নাট্যকার মনোজ মিত্র সমাজের বিভিন্ন দিক, হাস্যরস সৃজনের উদ্ভাবনী কৌশল নাটকের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। নাটকটিতে শ্রেণিসংগ্রাম স্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠেছে সেই সঙ্গে বাঁচার লড়াই ও টিকে থাকার লড়াই দেখিয়েছেন নাট্যকার এই নাটকে। এই লড়াই, এই সংগ্রামই বাংলা নাটকের ঐতিহ্য। জীবনের অন্তিম পর্যায়ে বাঞ্ছারামের মধ্যে দিয়ে মনোজ মিত্র জয়ের প্রতিষ্ঠা করেছেন। নব জীবনের কান্নার ধ্বনিতে নাটকের অন্তিমে আবার পত্রপুষ্প শাখায় বিচিত্র রঙ, রূপ ও রসের প্লাবন এনে দিল। বিবর্ণ, বিরস বাগান আবার সাজানো বাগান হয়ে উঠেছে। এই নাটকের বিষয়বস্তু নিয়ে নাট্যকার লিখেছেন তার প্রথম নাটক 'মৃত্যুর চোখে জল', এর আঠেরো বছর পরে নাট্যকারের লেখা 'সাজানো বাগান' নাটকটি। 'মৃত্যুর চোখে জল' নাটকের বঙ্কিম—এই সাজানো বাগান নাটকে বাঞ্ছারাম হয়ে ফিরে এসেছে। 'সাজানো বাগান' আমরা বৃদ্ধ বাঞ্ছারামকে দেখি, তার একটি বাগান আছে। বাগানটিতে নানারকম ফলের গাছ আছে, বাঞ্ছারাম সেই বাগান আগলায় লাঠি হাতে। নাটকটির বিষয়বস্তু এক বৃদ্ধর বেঁচে থাকার সুতীব্র লড়াই। শুধু বাংলা নয় সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে রোধ করা হল গণতন্ত্রের কণ্ঠ। প্রায় দুই বছর এরকম অবস্থা ছিল, সেই পরিস্থিতিতে মনোজ মিত্র লেখেন 'সাজানো বাগান' নাটকটি। 'সাজানো বাগান' দু অঙ্কের নাটক। প্রথম অঙ্কের দৃশ্য সংখ্যা পাঁচ এবং দ্বিতীয় অঙ্কের দৃশ্য সংখ্যা চার। প্রথম দৃশ্যে আমরা দেকি পচানব্বই বছরের বৃদ্ধ বাঞ্ছারামের মাটির চালা বাড়ি ও বাগান। ঐ বাগানকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে নাট্যকাহিনি। নাটকের শুরুতেই বোঝা যায় মৃত জমিদার ছঁকড়ি দত্ত বাঞ্ছারামের বাগানটি হাতিয়ে নেবার জন্য সারা জীবন চেষ্টা চালিয়ে গেছে, ব্যর্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে, সে প্রেতাত্মা হয়ে বাঞ্ছারামকে ভয়ও দেখিয়েছে। বাঞ্ছারামের নাতি গুপি সাত হাজার টাকায় বাগান বেঁচে দিয়ে মুনাফা নিতে চায়। ছকড়ির ছেলে নকড়ি কৌশলে বাগান নিতে চায় সে শর্ত করে বাঞ্ছারামের মৃত্যুর পর ঐ বাগানের অধিকার বর্তাবে নকড়ির উপর। যে কদিন বাঞ্ছারাম বেঁচে থাকবে সে কদিন নকড়ি বাঞ্ছারামকে মাস মাস দুশো করে গুণে দেবে। চতুর্থ দৃশ্যে দেখা যায় বাঞ্ছারামের নাতি তার নববিবাহিত স্ত্রীকে নিয়ে বাঞ্ছারামের কাছে আসে। পদ্মর সেবায় বাঞ্ছারাম সোজা হয়ে আবার হাঁটে, নাটকের শেষে নাট্যকার নাটকটির অসাধারণ পরিণতি দেখিয়েছেন—বাঁচার লড়াই, টিকে থাকার লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে বাঞ্ছার বেঁচে থাকার কাহিনি নাট্যকার বর্ণনা করেছেন। চলচ্চিত্রে এই বাঞ্ছারাম চরিত্রেই নাট্যকার নিজে অভিনয় করেছেন। নাটকে বাঞ্ছারামের মৃত্যু হয়নি, মৃত্যু হয়েছে অতি লোভী জমিদার ছঁকড়ি ও তার ছেলে নকড়ির। বাঞ্ছারামের আবদারগুলো নকড়িকে জানানোর পরে সে

রাত্রেই বাঞ্ছার ঘরে জন্ম নেয় এক শিশুপুত্র, গুপি ও পদ্মর সন্তান। যে রাত্রে বাঞ্ছারাম ফলিডল খাবে বলেছিল সে রাত্রে বাঞ্ছারাম মারা যায়নি। নকড়ি যখন দেখে বাঞ্ছারাম মারা যায়নি, তখন সে কারণ জিজ্ঞেস করলে বাঞ্ছারাম বলে সে মরতেই চেয়েছিল, কিন্তু তার ঘরে জন্ম নিয়েছে তার নাতির এক পুত্র। এই পুত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে তার আর মরা হল না। হতাশায় জর্জরিত হয়ে হার্টফেল করে মৃত্যুবরণ করে নকড়ি। শিশুর কান্না বাঞ্ছারামকে আবার বাঁচতে শিখিয়েছে। নাটকে নাট্যকার দেখিয়েছেন জমিদারের সঙ্গে প্রজাদের দ্বন্দ্ব চিরকালীন, জমিদারদের উত্তরাধিকার সূত্রে এই দ্বন্দ্ব দেখা গিয়েছে যা নাট্যব্যক্তিত্ব মনোজ মিত্র তাঁর নাটকে লিখেছেন। প্রজাদের শোষণ করে জমিদার অর্থভাণ্ডার গড়েছে কিন্তু সেই অর্থে ভাগ বসায় বাঞ্ছারাম। নকড়ির বাবা ছকড়ি বাঞ্ছারামের বাগানের দখল নিতে পারেনি আর নকড়িও পারেনি। বাংলা নাটকে যে লড়াই, যে সংগ্রামের ঐতিহ্য দেখানো হয়েছে নাট্যকার মনোজ মিত্রের সাজানো বাগানেও সেই লড়াই স্পষ্ট। বাঞ্ছারাম শুধু লড়াকু কোনও চরিত্র নয় নতুন প্রাণের সান্নিধ্যে জীবন যুদ্ধে জয়ী এক চরিত্র। বাংলা নাটকের মধ্যে এক অন্যতম নাটক ‘সাজানো বাগান’, এই নাটকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নাট্যকার সুন্দরভাবে দৃশ্যের পর দৃশ্য সাজিয়ে বঞ্চিত বাঞ্ছারামের সব হারানোর দুঃখ দূর করে দিয়েছেন, অভাব থেকে বাঞ্ছার পরিবারের মুক্তির পথ দেখিয়েছেন। এটি একটি মানবিক মূল্যবোধের নাটক হয়ে উঠেছে। বিশিষ্ট নাট্যকার মনোজ মিত্র এই নাটকে তৎকালীন সামাজিক, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি তুলে ধরে দেখিয়েছেন। গুণগতমান দিয়ে নয়, ঐতিহ্যগত দিক দিয়ে দেখলে দেখতে পাবো অধুনা নাট্যকারদের অবদানও কম নয়। বাংলা রঙ্গমঞ্চের প্রদীপের আলোয় প্রতিফলিত হয়েছে সমকালীন জীবন, সমাজ, রাজনীতির চিত্র। নাট্যকার মনোজ মিত্র তাঁর নাটকে সেই বিষয়গুলি দেখিয়েছেন।

গ্রন্থপঞ্জি :

১। ঘোষ ড. অজিত কুমার ‘বাংলা নাটকের ইহিতাস’। দেজ পাবলিশিং, কলকাতা - ৭০০০৭৩। পঞ্চম সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০১৬, আশ্বিন ১৪২৩।

২। ঘোষ ড. জগন্নাথ ‘বাংলা নাটকের ইতিহাস’। প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা ৭০০০০৯। প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ২০০৯। জানুয়ারি, ২০১৫।

৩। মিত্র, মনোজ — নাটক সমগ্র। প্রথম খণ্ড। মিত্র ও ঘোষ প্রকাশনা, কলকাতা ৭৩। ষষ্ঠ মুদ্রণ, পৌষ ১৪২৩।

৪। মিত্র, মনোজ — নাটক সমগ্র। দ্বিতীয় খণ্ড। মিত্র ও ঘোষ প্রকাশনা, কলকাতা ৭৩। পঞ্চম মুদ্রণ, পৌষ ১৪২২।

স্বাধীনতা সংগ্রামে বিস্মৃত নারীবিপ্লবী

দিশা খাসনবীশ
(শিক্ষিকা, ইতিহাস বিভাগ)

বাংলার নারী মুক্তি সংগ্রামে যোগ দিয়েছেন প্রাণের টানে, মত ও পথের গোঁড়ামী বিবর্জিত স্বাধীনতার অমোঘ আর্কষণে। দেশের শৃঙ্খল মোচন করতে গিয়ে প্রথমে তাঁদের ভাঙতে হয়েছে নিজেদের হাতের শিকল। তাঁরা সমাজ-সংস্কারের পরোয়া করেননি, অশুভ পরিনামের ভয়ে কম্পিত হননি। নারীর আজন্ম বঞ্চিত, নিপীড়িত সত্তার সামনে দাঁড়িয়ে শোষকের পেষণ-যন্ত্র নিজেই হতবাক হয়ে গেছে। এরা বদলে দিয়েছে ''স্বাধীনতা'' শব্দের অর্থ। এই সকল বীরাঙ্গনা-রা পৃথক পৃথক সামাজিক পরিমন্ডল থেকে উঠে এসেছেন ও বিভিন্ন পথে হেঁটেছেন কিন্তু লক্ষ্য তাদের সকলেরই এক ছিল। সে লক্ষ্যের নাম ছিল ''মুক্তি''। তাদের কেউ মিছিলে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে নির্মম প্রহারে অচেতন হয়েছেন অথবা গারদের অন্ধকারে কাটিয়ে দিয়েছেন জীবনের অধিকাংশ সময়। তবুও তারা সংগ্রামের পথ থেকে সরে আসেননি। সময়ের আর অবহেলায় ঝড়ে উড়ে যাওয়া ইতিহাসের সেই সব ছেঁড়া পাতা কুড়িয়ে আনতে আমরা পুরোপুরি সফল নই, তবুও প্রচেষ্টা করলাম তুলে ধরতে মুক্তি সংগ্রামে নিয়োজিত কিছু বীরাঙ্গনাদের সংগ্রামের কাহিনী।

গিরিবালা দে — মাত্র দশ বছর বয়সে ৪২ বছর বয়স্ক নকুল দে'র সাথে বিবাহ হয়েছিল গুরুচরণ ও চম্পকলতা চৌধুরির মেয়ে গিরিবালার। মেদিনীপুরের রামগঞ্জের এই বালিকা তিন বছরের মধ্যেই বিবাহ হয়। বাংলার আরও পাঁচজন বিধবার মতো তাঁর জীবনেও করুন পরিণতি ঘটতে পারত। ঘটেনি কারণ সেই ট্রাজেডির নায়িকা নিজেকে বলিষ্ঠ ভাবে প্রতিষ্ঠা করেছে স্বাধীনতার ইতিহাসে।

নকুলবাবুর মৃত্যুর পর নিজ গ্রামে ফিরে এসে লেখাপড়া চালিয়ে যেতে থাকেন তিনি। সেই সময় তাঁর দাদা রাধারমণ তাকে নিয়ে গেলেন তৎকালীন কংগ্রেস দলনেত্রী লক্ষীমণি হাজরার কাছে। শুরু হল গিরিবালার জীবনের নতুন অধ্যায়। গিরিবালা স্বাধীনতার অর্থ বুঝলেন, এদেশের মুক্তি সংগ্রাম সম্পর্কে সচেতন হলেন। তাঁর প্রধান শক্তি ছিল তাঁর অসাধারণ বাগ্মীতা। চল্লিশের দশকে সভার পর সভায় বত্তৃতা দিতেন তিনি, শ্রোতারা মন্ত্র মুগ্ধ হয়ে শুনতেন। মেদিনীপুরে যখন ''জাতীয় সেনাদল'' গঠিত হয় তখন গিরিবালা তাঁর 'বাঘিনী' বাহিনীর সক্রিয় সদস্য ছিলেন। তখন থেকেই ছদ্মনাম নেন ''ঊষা চৌধুরী''। বিশ্বাস ঘাতকদের কঠিনতম শাস্তি দিতেও এই সাহসিনীর হাত কাঁপত না।

স্বাধীন তাম্রলিপ্ত সরকারের অবসানের পর ২ বছর কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে নার্সিং এর প্রশিক্ষণ নেন গিরিবালা। ফিরে এসে কাঁথি, তমলুক ইত্যাদি হাসপাতালে কাজ করার পড় সুশীল ধাড়ার ''মাতৃভবন হসপিটাল''-এ কাজ শুরু করেন মহিষাদলেই। কয়েক মাসের মধ্যে তাঁকে মুর্শিদাবাদে বদলি করা হয়। এই বদলির আবেদন মঞ্জুর না করায় তাকে ইস্তাফা দিতে হয়। একাকী এবং অসহায় ভাবে তাঁর শেষ

জীবন অতিবাহিত হয়। যতদূর সম্ভব জানা যায় ১৯৯০ সাল পর্যন্ত তিনি বেঁচেছিলেন তবে, তার পর কি হয়েছিল তা আর জানা যায় নি।

মাতঙ্গিনী পাল— না, মাতঙ্গিনী হাজরা নয়, ইনি হলেন মাতঙ্গিনী পাল। মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে প্রায় মুছে যাওয়া এক চরিত্র। তাঁর বাবা ছিলেন পুরুলিয়ার কংগ্রেস কর্মী দেবেশ্বর পাল। একমাত্র তাঁর জীবনসঙ্গী ছাড়া পরিবারের আর কেউই চাননি মাতঙ্গিনী বাড়ির ঘেরাটোপের বাইরে কিছু করুন। তবে যাঁর চেতনায় দেশ এবং স্বাধীনতার আলো জ্বলছে তাঁকে কি কেউ আটকে রাখতে পারে?

১৯৩২ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি বেলদা গ্রামে প্রায় ৩০০ লোকের উপস্থিতিতে এক জনসভা হয়। সভার নেতৃত্ব দেন মাতঙ্গিনী। তার ২ দিন পরে গান্ধী দিবসে ১১০ জনের একটি মহিলা মিছিল সংগঠিত করেন তিনি, এবং আইন ভেঙেই পথে হাঁটেন। এর ফলে তিনি গ্রেপ্তার হন। সাজা হয় তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ড। ৪ঠা জুলাই 'বন্দী দিবস' উপলক্ষ্যে তাঁর আবার মিছিল বের হয়। এতে যোগদান করেন ৩০০ জন, কাঁথি হাইস্কুল থেকে শুরু হয় তা পৌঁছায় জেল গেটে। স্লোগান উঠেছিল—"বন্দী দিবসের জয়" ব্রিটিশ শাসন ধ্বংস হোক"। পুলিশের সামনে যা ছিল এক চপেটাঘাত। রাগে উন্মত্ত হয়ে ছুটে এল অ্যাডিশনাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট অফ পুলিশ। ঝাঁপিয়ে পড়ল মাতঙ্গিনীর উপরে। তাঁকে টেনে হেঁচড়ে মিছিল থেকে বের করে এনে ভয়ংঙ্কর প্রহার করা হল। শরীর যন্ত্রণায় মুচরে উঠল-কিন্তু শক্তি কমল না মাতঙ্গিনীর। ঠিক একবছর পরে এলাকাবাসী আবার দেখলেন মাতঙ্গিনী পালকে, ঠিক একই দিনে এবং একই কারণে, অর্থাৎ "বন্দী দিবসের" নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন তিনি। দুর্ভাগ্য এই যে যদি কোনও ইতিহাস বইতে 'মাতঙ্গিনী' নামের পাশে "পাল" পদবীটি দেখি, আমরা তা ভুল বলেই ধরেই নেব।

শহীদ রাসমণি- তাঁর জন্ম কবে হয়েছিল সে খবর অবশ্য কেউ রাখেনি। তবে ময়মন সিংহ জেলার সুসঙ্গ পরগণার ভেদিপুরায় বাগাবারী গ্রামে তাঁর জন্ম। তাঁর নাম ছিল 'রাসমণি'। বাঙালি অবশ্য 'রাসমণি' বলতে একজন নারীকে বোঝে। ভেদিপুরা, বাগাবীর অবশ্য এই সমস্ত আওতার একেবারে বাইরে। তবুও এই গরীব চাষী পরিবারের মেয়ে অগ্নিযুগের বাংলায় একটি নাম হয়ে উঠেছিল।

পাঁচমন ধান আর কড় কড়ে দশ টাকা—বারো বছরের রাসমণিকে এক হত দরিদ্র টঙ্ক স্বামীর হাতে তুলে দেওয়ার এই ছিল বিনিময় মূল্য। বিবাহ অবশ্য অল্প দিনে শেষ হয়েছিল বৈধব্যে। এরপর রাসমণির জীবন যুদ্ধ চলতে থাকে। রোয়া ধান লাগানো, কেটে আনা ধান ঢেকিতে ভেঙে চাল তৈরি করে হাঁটে বেচতে যাওয়া, বনের কাঠ কুড়িয়ে বিক্রি করা ইত্যাদির মাধ্যমে। রাসমণিদের গ্রামের অধিকাংশই ছিল ভূমিহীন ঠিকা চাষী যারা মাঝে মধ্যেই মহাজনের ঋণের জালে জড়িয়ে পড়ত, এই দশটাকার সুদ পাঁচ বছরে আড়াইশো টাকা পর্যন্ত হয়ে যেত। সর্বহারা চাষীর রাগ গিয়ে পড়ত বাড়ির মেয়েদের উপর। কাজেই হাজার নারীর জীবন পৃথিবীর বুকে নরক হয়ে উঠত।

রাসমণি শুরুটা সেই নরকের মধ্যেই করেন। তবু সময়তো একই রকম থাকে না। ভারতের মানুষও তখন সংগঠিত হচ্ছেন সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতায় বিভিন্ন পতাকার তলে। "মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি"

এই রকমই একটি দল। যার পতাকা কাঁধে তুলে নিলেন বাংলার শ্রমজীবী মেয়েরা। রাসমণি ও তাঁর মতো অনেক মেয়েরাই তাঁর জীবনের মানে খুঁজে পেলেন। তাঁরা অনুভব করলেন শুধুমাত্র স্বামী বা মহাজনের হাতের পুতুল তাঁরা নন। এই সময় বাংলায় দেখা দিল পঞ্চাশের মন্বন্তর। হাজং চাষীদের নিয়ে স্কোয়াড গঠন করলেন রাসমণি। এছাড়াও মেয়েদের জন্য তৈরি করেন কুটির শিল্প। রাসমণি ছিলেন প্রখর বুদ্ধিমতী। তিনি নারী সমাজের অশিক্ষা দূর করতে ‘‘নৈশ্য বিদ্যালয়” এরও স্থাপন করেছিলেন।

১৯৪৫-৪৬ সাল। তেভাগা আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল বাংলার মাঠে ঘাটে। ময়মনসিংহ পিছিয়ে ছিল না। হাজার কৃষকদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল এক বিরাট বাহিনী, যাতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন রাসমণি। তাঁরা সম্মিলিত ভাবে আক্রমণ করেছিলন ‘‘ইস্টান ফ্রন্টিয়ার রাইফেল” বাহিনীকে। এইভাবেই তাঁরই ছত্র ছায়ায় সংগঠিত হল বিক্ষিপ্ত প্রতিরোধ।

১৯৪৬ সালের ৩১ জানুয়ারী প্রচার দল নিয়ে ক্লান্ত রাসমণি বিশ্রাম নিচ্ছিলেন বহেরাতলি গ্রামের কাছাকাছি একটি এলাকায়। গ্রাম তখন প্রায় পুরুষ শূন্য। এই সুযোগে গ্রামে ঢুকে পড়েছে পঁচিশ জনের সৈন্য বাহিনী, যারা গ্রামের নারীদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে। এই ঘটনায় প্রতিবাদে সোমেশ্বরী নদীর তীরে মুখোমুখি হল দুই দল। আধুনিকতম অস্ত্রে সুসজ্জিত পঁচিশ জন সৈন্য আর এক বয়স্ক মহিলার নেতৃত্বে কাটারি, বর্শা হাতে নিরন্ন পঁয়ত্রিশ জন সাধারণ চাষী। তারপর ইতিহাস। রুশ বিপ্লব, ভিয়েত নাম বা কিউবার কাহিনী কোনও কিছুর থেকেই সোমেশ্বরী নদীর জলে সেদিন যে রক্ত বয়ে গিয়েছিল তাঁর গৌরব এদের চেয়ে এতটুকুও কম নয়। তবুও তাঁদের লড়াই থামেনি। অবশেষে স্টেনগান ফেলে পালাতে বাধ্য হয় সৈন্যরা। হাজং সম্প্রদায় সেদিন দেখিয়ে দিয়েছিল নারীদের গায়ে হাত দিলে লাঞ্ছিত হয় সমগ্র বাংলাদেশের সম্মান। তাঁর শ্রেষ্ঠ সন্তানরা এর প্রতিশোধ নেবেই।

Women Empowerment

Puja Kumari
(Teacher, Hindi Depertment)

In this male dominated society, where money power and muscle power govern the relationship between men and women for ages, men have claimed themselves superior to women in social and economic activities.

Before 1921 women were considered almost non-existent. It took a lot of years to realize their power. New thinking evalved in many democratic countries, making it a women-effective society. Women empowerment states equality to women, making them powerful. Although mere equality is not sufficient. The concept of legal equality for women has come like fresh air, making them aware of their rights. Gender equality is not only a fundamental human right but a necessary foundation for a peaceful prosperous and sustainable world. It has been very tough for women to stand out in a man-favorable society.

Women have a history of being ill-treated. The status they enjoy today was not an easy feat in any realm of imagination. It has been a long journey steeped in pain and suffering. India is a third-world country and has the most number of ill-treated women in the society. Our country has a history of many social evils to date, like female focticide, sati system, etc. Many researchers have even demonstrated that women are not inferior being in the emotional, stability, capacity or any other. To date, the discussion of women lies in the hands of men.

Our county is in great need of women's empowerment, as it is not safe for women at all. Being in the 21st century many families have backward thoughts on education. Most of them are still not allowed to pursue their studies at a higher level or not allowed to work. In our male-dominated country, women work hard to prove their presence at the work place. Some times they face sexual harassment too. It's high time for women to raise their voices against unfairness and injustice happening to them.

Women empowerment doesn't mean playing women's cards and getting sympathy, it's the goal to get equality in this gender biased society, urging for equal oppartunities, being in education or job. Women should stand for the abusive relationship they are in. A lot of laws and NGOS have helped a lot of them to stand firm and free themselves from any crisis.

"The Effect of Malnutrition on Development"

Soumyajit Kundu
(Department of Human Development,
Teacher, Sub-Human Development)

Introduction : Malnutrition is a universal problem that has many forms. No country is untouched. It affects all geographics, all age groups, rich people and poor people and all sexes. All forms of malnutrition are associated with various forms of ill health and higher levels of mortality. Undernutrition explain around 45% of deaths among children under 5, mainly law and middle-income countries.

As far as adverse effects of child malnautrition are concerned, growth failure and infections are quite important. Malnaurished children do not attain their optimum potential in terms of growth and development, physical capacity to work and economic productivity in later phase of life. Undernutrition increases the risk of infectious diseases like diarrhoea, measles, malaria and pyromania and chronic malnutrition can impair a young child's physical and mental Development [Source : www. globalnutrition, report.org]

Malnutrition refers to deficiencies, excess or imbalances in a person's intake of energy and nutrients. The term malnutrition covers 2 board groups of conditions. One is 'undernutrition"—Which includes stunting (low height for age), wasting (low weight for height). underweight (low weight for age) and micronutrient deficiencies (a lack of vitamins and minerals). The other is overweight, obesity and diet related noncommunicable diseases (Such as heart diseases, stroke, diabetes, cancer).

Some effects of malnutrition include :

(1) Short and long term health problem, (2) Slow recovery from women illness, (3) A higher risk of infections, (4) Difficulty focusing at work or school, (5) Some deficiencies can trigger specific health problem— A lack of vitamins A, (6) A lack of vitamin C can result in Scurvy.

Some signs and Symptoms of malnutrition include :

(1) A lack of appetite or interest in food or drink.
(2) Triedness and irritability,
(3) Depression,
(4) Always feeling Cold,
(5) Loss of fat, muscle mass and body tissue
(6) A higher risk of complications after Surgery

(7) A lack of growth and low body weight

(8) Slow behavioural and intellectual development, learning difficulties.

Some causes of Malnutrition : A low intake of food, Mental health conditions, social and mobility problem, Digestive disorders and Stomach Condition, Alcohol use disorder.

Some Diagnosis are—(1) Blood tests for general screening and monitoring, (2) tests for specific nutrients, such as iron or vitamin, (3) Albumin tests, which may indicates liver or kidney disease, (4) A tool to identify risk.

The Treatment are— (1) On going screening and monitoring, (2) Making a Dietary plan, which might include taking Supplements. (3) Treating specific symptoms, such as nausea, (4) Treating any infections that may be present, (5) Checking for any mouth or Swallowing problems.

Physical & Behavioural Development :

(1) Alderman et al, (2006) established a cause-effect relationships since chronic problems might be related to conditions that existed before the episode of SAM. Severe acute malnutrition (SAM) is a life-threatening conditions that after occurs during a critical period for a child's growth and development. Treatment of SAM is among the most cost-effective interventions to prevent childhood death.

Cognitive & Brain Development :

(1) EKheluenetable et al, (2020) Showed that childhood undernutrition, marked by stunting, is connected with age -long reduction in cognitive and academic achievement. It is of interest to achieve healthy growth and optimal cognitive development in early childhood. The objective of the study was to examine stinting considered to adversely influence cognitive development among children and therefore of public health influence.

Mental Development & School Achievement :

(1) Khanam et al, (2011) examined the impact of childhood malnutrition on schooling performance in rural Bangladesh. The revealed that malnourished children are less lively to enrol in school on time and achieve in age-appropriate grade other important determinants of schooling outcomes include infrastructure and education level of parents. The reviews helped to understand the causes, effects, symptoms and method of eradicating malnutrition. It has also help to find out the gap in the research work done on the effect of malnutrition on child development. Most of the work have been found to be done on physical development, brain and cognitive functioning, academic achievement and social development. But it was found that the effect of language acquisition was neglected.

Reference :

(1) Alderman H, Hoddinott J, Kinsley, B, (2006). Long term consequences of early childhood malnutrition. Oxford economics paper, vol-58, No-3

(2) Ekhaluenetable M, Barrow A, Tudeme G, (2020). Impact of Stunning on early childhood development in Benin. Egyption podiatric Association Gazette, vol-68, No-31

(3) Khanam R, Nghiem HS, Rahman M M. (2011). The Impact of childhood malnutrition on schooling. Journal of Biological Science, vol-10, No-4

(4) www.who.in

(5) www.medicalnewstoday.com

(6) www.intechopen.com

(7) www.nhs.uk

(8) www.vikaspedia.in

Importance of Handloom Sector

Dr. Sharmistha Ray
(Teacher, Department of Sociology)

West Bengal Handlooms attract the attention of the millions of people through out the world. According of the list of handlooms haring G.I. registered products, April, 2017, West Bengal occupies a significant (Geographical indication) place. Baluchari saris of Bishnupur, Murshidabad Silk, Dhanekhali sarees and Santipur.

Reasons for advantage of Handloom sector over the mill.

(a) A lot of time can be devoted:

As the weavers work in his house he can devote more time. In fact, he can denote a great part of his leisure time to handloom weaving.

(b) Availability of helping hands:

It is said that women and children are helping hand in rural productivity.
Naturally in working seen by they help the small members of doing the working.

(c) Starting and Closing facility at any time:

The weavers who are the owners of the looms have the facility of continuity on discontinuity their work at any time. They have freedom in their work.

A majority of Indian population are still living in villagers. The scenario is more or less same in West Bengal. The youth constitute a major part of the total population. The future of any nation has in the hands of the youth. The census report highlights the fact that the proportion of youth population increased steadily from 16.5% in 1971 to 19.2% in 2011. According to census of India 2011, every 5th person in the country are young people between the age group (10-24) years constitute 1.8 billion populations. The percentage of young people is growing faster in lower income nation. But now these needs are to be fall piled. This is the very important question. The skill and knowledge that the young people acquire must be matched with the current socio-economic condition.

The present situation of India in general and West Bengal in particular, is where the youth are looking for jobs on one hand, and on the other the industry is suffering from unavailability of skilled workers. Most of the rural youth in India as well as in West Bengal start working from then childhood mainly in agricultural sector. In rural economy agriculture is the first employment generating sector. Some people are working in cottage industries. But this proportion is very small. In most cases agricultural is the main source of income of the rural people. As a result, rural people are always facing from poverty. There are some reasons for this.

(a) Rural economy impact of season:

Rural economy is agrarian economy. Agriculture is seasonal affair. Sowing and harvesting are completely dependent on season. Sometimes the farmers have nothing to do. The seasonal character of agriculture adversely affects the earning of people and standard of living of rural areas.

(b) Lack of education and absence of knowledge:

One important problem that rural youth are facing is lack education, for which they are not able to utilize their energy in proper way. They are not able to know about the scientific and modern method of cultivation, method of agriculture, etc. Most of the rural youth isn't joining the course with proper guidance only for a degree. This creates two problems. On the one hand scientific methods are not applied in cultivation, and on the other hand they are not suitable for getting jobs in non-agricultural sectors.

(d) Little Capital Requirement:

The maintenance cost of the mills is very low. A normal capital is required to set up a handloom and worn on it.

(e) Cheep Standard of living:

Life style and standard of living is cheaper in village then urban area. So it is profitable for a weaver to work in village rather than working in town.

(f) Minimum the migration of rural work force to urban area.

Migration of rural people to urban area in search of education, job and better standard of living is a common feature. Though this migratory trend is an all India estimate, the weavers have some tendency in West Bengal. So in order to minimize the migratory tendency special attention must be given in handloom sector, which may be a major source of income of the rural people.

(g) Preference of Bengalese for Handloom products:

Bengali people particularly the ladies prefer to wear handloom saris. A time sari produced in handloom is a much of aristocracy. So the handlooms of Murshidabad, Bishnapur attracted the attention of the handloom lovers all over the world. This is one of the important factors that have helped the survival of the handloom industry.

Annamalai said that in January1978, Ivan Illich, author of De schooling Society's spent a great deal of time in 'Bapu Kuti'(Gandhijis' hut) and observed that this hut is the symbol of happiness, peace and demonstrates how the dignity of the common man can be brought up.

Annamalai also said that economic activity through spinning and weaving gave the nation confined and removes from slave mentality. The spinning gives the people a real sense of responsibility towards village.

Desai A. R. in his book 'Rural Sociology in India' (Rama Printers New Delhi, 2013) highlighted the difficulties faced by the cottage industries.

Durlov ('Prevalence of low back pain among handloom weavers in West Bengal[International Journal of Occupational and Envioronmental Health, 2014 Oct; 20(4): 333–339.source:https://www.ncbi.nlm.nih.govt/pmc/articles/PMC4164884.) said that Handloom weaving involves manually sorting raw materials, carding and spinning with a cord machine, and dyeing the fibers with acid and chrome. Pre-weaving, fibers are boiled in an acetic acid and dye solution, washed in running water, and dried.

Kasyap in his book 'Rural Marketing' (Third Edition, Peasrson, Delhi, Chennai, 2016) discussed about the rural economic structure wrote that farm and nonfarm sectors are the two basic constituents of the rural economy. Indian agriculture has graduated rapidly from food grain surplus economy. India is a largest producer of mangoes, coconut, bananas, milk and dairy products, cashew nuts, pulses, gingers, turmeric and varieties of vegetables. On the other hand the non farm sector includes secondary and tertiary sector.

Maheswari, S.R. in his book 'Rural Develpoment in India –A Public Policy Approach'(second edition) {Sage Publication, 1995} wrote that science and technology can play an important role in solving the intractable problems of developing countries, such as hybrid wheat reached India with effect of Green Revolution.

Dr. Rabindra Kumar in, in his article 'Khadi and Rural Development : A Gandhian View'(page-9-10) [Kurukshetra, A Journal of Rural Development, Vol.66, No.12, October 2018] discussed khadi refers to the National dignity of hand spun, hand woven cloth. Having the importance of cloth in mans'life. Mahatma Gandhi revolutionized large scale production of khadi by common men, i.e. villagers.

Kumar, said that the idea of khadis not only confind to hand spun and hand woven cloth, but it is an effective and most practical thought, a philosophy dedicated to Sarvodaya.

Saxena, has discussed about the role of KVIC (Khadi and Village Industries Commission) strengthening [KVIC : Strengthening Rural Economy, Kurukhetra, Vol.66, No:12, October 2018].

Saxena said that the main concern of KVIC is the welfare and socio-economic development of artisans and its' primary goal is strengthening the khadi brand.

SURVIVAL OF HANDLOOM INDUSTRY: THE REASONS

With the establishment of spinning mills towards the end of the 18th century, the hand spun years gave way to mill yarn until it became all but extinct. But weaving did not at any time because practically extinct as the spinning did. When to Indian Mills come into existence, as then product in the market, the result is to complete extinction of handloom industry. There was a fall of handloom industry below a certain level of decline.

There are some reasons for these:

(i) Variation in local tasks and needs:

A large variety of cloths could be woven in handlooms according to the tastes and needs at local people. But it was not possible to weave so many verities of items on a profitable basis. The Bengalese (in particular) used a great variety of clothing of different sizes and of variety of types. From so many historical records and religious texts, it should be mentioned have, that from the ancient time, the Bengalese wear variety of saris for variety of occasions. In time of worship they wear 'Garad' and Matna' sari, patta Bastra for marriage. There was also the variation in colours of saris of married, unmarried and widows, generally to unmarried Bengali and for married. On the other hand, the widow prefer white or light colored saris. So the mills which produce for large markets can hand by supply of the local needs.

(ii) No other occupation opens to weavers

Indian economy was predominated by agriculture. These people who take weaving as them occupation, have no other way to leave them weaving, because they face severe competition from other sector. There is no other option for them.

Handloom and Rural prosperity

The term indicates a mental future of a developed (model) village, where there are basic health facilities, pucca houses, good communications system, electricity, school, ration, Aadhar cards etc.

In order to make a village developed, special attention is given reduce unemployment among the rural youth by providing employment generating sector. Handloom occupation is important place in rural economy. Due to seasonal nature of agriculture handloom occupies a significant role in promoting employment.

India has a glorious history of handlooms, so it must be kept in mind handloom flourished during the period under the patronage of Nawab and Maharajas (kings). Baluchari and Swarna-chari sarees of Bishnupur, Murshidabad silk, Saris of Santipur and Bengal Tant Sarees are our pride. So special attention must be given to handloom weavers and young weavers to improve their socio-economic condition, which shows a new path to youth empowerment.

Conclusion:

Handlooms contribute one of the important employment generating sector in rural economy. History of Indian handloom is very old. Handloom industries flourished during the period of Hindu Kings and Muslim Samrats. During British period, there was decline in handloom industries. But after Independence Handloom industry slowly emerged.

In order to reduce rural poverty attention must be given to handloom industries which show a new way to rural youth.

References:

Books:

1. Aiyer, H.R – "Economics of Textiles, Trade and Industries In India (Vore and co Publisherr Pvt. Ltd. Bombay, 1977)
2. Amalsad, D.M. – Organization of cotton Handloom & Industry (Orient Longman Ltd., Madras, 1975)
3. Bagchi A.K. – Private Investment in India, 1900 – 1939 (Orient Longman Ltd., Madras, 1975)
4. Chakraborty, P.K. – Problems of Co-operativee Development In India with special references to West Bengal, (S.Chand and Co. Ltd. – New Delhi, 1983)
5. Das, Nagen Chandra – 'Development of Handloom Industry' – Deep and Deep Publication – New Delhi – 1986.

Reports and journals:

6. Government of India, Ministry of Textile-Note on Handloom Sector, 30th December, 2015
7. Development Commissioner-Fact sheet, June 2017- handlooms.nic.in/writeraddata/ 2538pdf.
8. Handloom Census –NCAER-www.ncaer.org/data
9. Handloom Census-2009-10.
10. Planning Commission, Government of India October, 2014-consultation paper on handlooms.

দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরের ইতিবৃত্ত

প্রীতি বিশ্বাস

(ইতিহাস বিভাগ, রোল ৪৮৬, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ মহাবিদ্যালয়)

কলকাতা থেকে একটু দূরেই হুগলি নদীর তীরে অবস্থিত দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দির পশ্চিমবঙ্গের একটি অন্যতম পীঠস্থান। সারা বছর এই ধর্মস্থানে বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষের আনাগোনা লেগেই থাকে। কিন্তু কীভাবে এই দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দির গড়ে উঠেছে সেই সম্বন্ধে সঠিক তথ্য হয়তো কেউ জানে না।

দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরের ইতিহাস :

কথিত আছে, ১৮৪৭ সালে রাণী রাসমণি অন্নপূর্ণা পুজোর জন্যে কাশীতে তীর্থযাত্রার আয়োজনকালে দেবী মা কালীর স্বপ্নাদেশ পান। এরপর ১৮৪৭ সালে গঙ্গার তীরে সমস্ত জমি বিক্রি করে নির্মাণের কাজ শুরু করেন ও ১৮৫৫ সালে হুগলী নদী তীরে মন্দির নির্মাণ করেন। যদিও এই কাজে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের দাদা রামকুমার চট্টোপাধ্যায় রাণীকে সাহায্য করেছিলেন। কারণ তিনি প্রধান পুরোহিত ছিলেন। পরে পরমহংসদেব-ই হয়ে ওঠে মন্দিরে প্রধান পুরোহিত। স্থাপনের জন্য হেস্টি নামে একজন ইংরেজ থেকে ২০ একক জমি কেনা হয়।

স্থাপতশৈলী ও গঠন রীতি : দক্ষিণেশ্বর কালী বাড়ি মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে প্রায় ৮ বছরে ৯ লাখ টাকা ব্যয় করা হয়েছিল। পূর্বের দিকের মন্দিরের অবস্থিত বিগ্রহ মাতা 'ভবতারিণী কালীমা' নামে পরিচিত। মন্দিরের দালানটির উচ্চতা ১০০ ফুট এবং ৪৬ বর্গফুট প্রসারিত। মন্দিরের গর্ভগৃহে রূপোর পদ্মর উপর মা বসে এসেছেন। মূল মন্দিরের আট চালা পূর্বমুখী শিবের মন্দিরের দক্ষিণে রয়েছে নাট মন্দির। এছাড়া মন্দিরের ভিতরে রাধা-কৃষ্ণের মন্দির আছে, উত্তর পশ্চিম কোণে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের বাসগৃহ।

অবস্থান : দক্ষিণেশ্বর, কামারহাটি, উত্তর ২৪ পরগণা জেলা। দুপ্রান্তে বালি ব্রিজ দেখা যায়। ১৯৩২ সালে ডিসেম্বর মাসে এই ব্রিজ চালু হয়।

দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরের ইতিবৃত্ত, লেখক, নির্মল কুমার রায়, সম্পাদনা, কুশল চৌধুরী।

দক্ষিণেশ্বরের আলৌকিক ঘটনা

পশ্চিমবঙ্গে—অনেকগুলি কালী মন্দির রয়েছে, যেগুলি বিশেষ ভাবে প্রসিদ্ধ। সেগুলির মধ্যে একটি হল, রাণী রাসমণির স্বপ্নের মন্দির। মা-কালীকে এই মন্দিরে ভবতারিনী নামে পুজো করা হয়।

দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরের প্রতিষ্ঠার পিছনে রয়েছে এই প্রসিদ্ধ কাহিনী। ১৮৫৫ সালে হুগলী নদীর তীরে এই বিখ্যাত মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করে ছিলেন 'রাণী রাসমণি'। দেবীর স্বপ্না আদেশেই নাকি নির্মাণ করার দায়িত্ব পেয়েছিলেন রাণী। তখনকার দিনে প্রায় ৭ লক্ষ টাকা খরচ করেছিলেন। এই মন্দিরটি বঙ্গীয় স্থাপত শৈলী নবরত্ন ধারায়ে নির্মিত। মূল মন্দিরটি তিনতলার ঘর, দুটি তলে রয়েছে নয়টি চূড়া। এর উত্তরে রয়েছে রাধাকান্ত নামে পরিচিত রাধাকৃষ্ণ মন্দির এবং দক্ষিণে রয়েছে, নাট মন্দির। মন্দিরের উত্তর-পশ্চিম কোণে রয়েছে রামকৃষ্ণদেবের বাসস্থান। ১৮৪৭ সালে এই বিরাট মন্দিরের নির্মাণ কাজ শুরু হয় এবং শেষ হয় ১৮৫৫ সালে। এই মন্দিরের প্রধান পুরোহিত ছিলেন রামকুমার চট্টোপাধ্যায় যার সহজাত ছিলেন গদাধর, যিনি রামকৃষ্ণদেব নামে প্রসিদ্ধ। পরে রামকুমারের মৃত্যুর পর প্রধান পুরোহিত হন রামকৃষ্ণদেব।

যদিও রাণী রাসমণি কখনো এই মন্দির নির্মাণের কথা ভাবেননি। তিনি দেবীর পূজা দেবেন বলে কাশীতে তীর্থের আয়োজন করেছিলেন। যাত্রার ঠিক আগের দিন রাতে দেবী স্বপ্না আদেশ পেয়েছিলেন মা ভবতারিণীর। তিনি বলেন, তাঁর কাশী যাওয়ার প্রয়োজন নেই। তিনি গঙ্গানদীর তীরেই কালী মূর্তির পূজা করলেই দেবী সেই মূর্তিতেই আবীর্ভূত হয়ে পূজা গ্রহণ করবেন।

আজও দক্ষিণেশ্বর মন্দির বিশেষ ভাবে জাগ্রত। ভক্তরা মনে করেন যে, ভবতারিণীর পূজা করলেই মনের সমস্ত ইচ্ছা পূরণ হবে। ফলে এই মন্দির আজও মানুষের মনে এক বিশেষ স্পর্শ পেয়ে থাকে।

কম্পিউটারের বিবর্তনের ইতিহাস

রজতশুভ্র ঘটক

(ছাত্র, ইতিহাস বিভাগ, সেমিস্টার ৩, রোল ৪৮৯)

আনুমানিক ৩০০ খ্রি: পূর্বে যন্ত্রের সাহায্যে গণনার যাত্রা শুরু হয়েছিল। সেই থেকে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে নানা ধাপ পেরিয়ে কম্পিউটার ও তার প্রযুক্তির অগ্রগতি অব্যাহত। সূচনাপর্বে কম্পিউটার ছিল শুধুমাত্র একটি গণনার যন্ত্র, নাম অ্যাবাকাস। প্রকৃতপক্ষে তখন আমরা ক্যালকুলেটর বলতে যা বুঝি অ্যাবাকাস ছিল তাই। আজ কম্পিউটার বলতে সাধারণভাবে যে যন্ত্রটির চেহারা আমাদের চোখের সামনে ভাসে, তা প্রযুক্তিগত বিবর্তনের দীর্ঘ পথ অতিক্রমের ফল। এই বিবর্তনে একের পর এক যেসব যন্ত্রের আর্বিভাব ঘটেছে, সেগুলি হল।

(১) অ্যাবাকাস

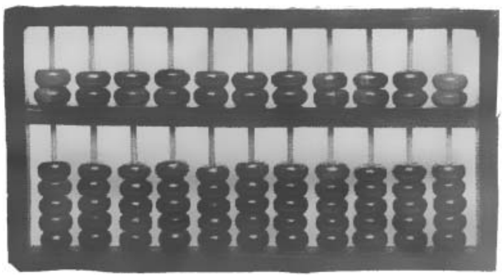

(২) পাস্কালের যান্ত্রিক গণক

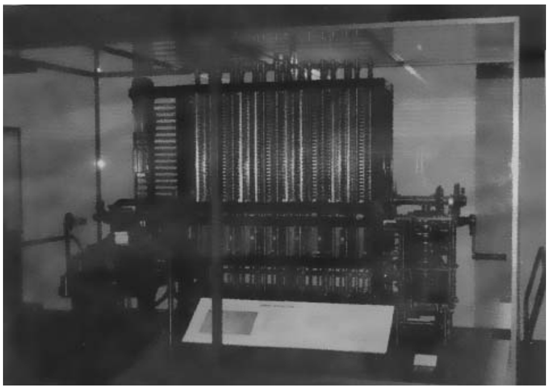

(৩) ডিফারেন্সিয়াল ইঞ্জিন

(৪) ENIAC

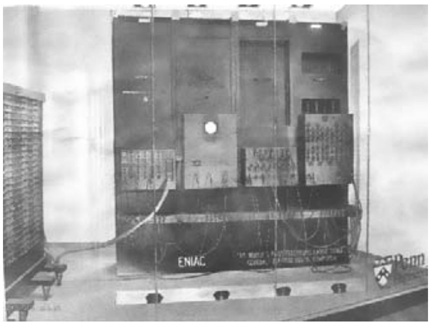

(৫) UNIVAC

কম্পিউটারের প্রজন্ম

কম্পিউটার সংক্রান্ত আলোচনায় 'প্রজন্ম' বলতে প্রযুক্তিগত ধাপকে বোঝায়। অর্থাৎ কম্পিউটারের প্রজন্মের ধারাকে বিশ্লেষণ করা হলে কম্পিউটার নামক যন্ত্রের বিকাশের পর্যায়গুলিকে জানা যাবে।

প্রথম প্রজন্মের কম্পিউটার (১৯৪২-১৯৫৫)

১৯৪২-১৯৫৫ সালের মধ্যে যে সব কম্পিউটার তৈরি হয়েছে সেগুলিকে বলা হয় প্রথম প্রজন্মের কম্পিউটার। ওই সব কম্পিউটারের গঠনতান্ত্রিক কাঠামোর মূল যন্ত্রাংশ ছিল ভ্যাকুয়াম টিউব। প্রযুক্তিগত অগ্রগতির প্রতীক হিসাবে এই সব কম্পিউটারের সুবিধা থাকলেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এগুলির ক্ষেত্রে কিছু অসুবিধাও ছিল।

প্রথমত, এইসব কম্পিউটার ছিল আকারে বড়ো। দ্বিতীয়ত, এগুলি সবসময় বিশ্বাসযোগ্যতার সঙ্গে কাজ করতে পারতনা। তৃতীয়ত, শীততাপ নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা ছাড়া এগুলিকে ব্যবহার করা যেত না। চতুর্থত, প্রায়ই এসব কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার ব্যবস্থা বিকল হয়ে পড়ত। যেমন ভ্যাকুয়াম টিউব প্রায়ই খারাপ হয়ে যেত। তখন তা বদলানো ছাড়া উপায় থাকত না। পঞ্চমত, এগুলি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যাওয়ার উপযোগী ছিল না।

দ্বিতীয় প্রজন্মের কম্পিউটার (১৯৫৫-১৯৬৪)

দ্বিতীয় প্রজন্মের কম্পিউটারে স্বভাবতই আরও উন্নত প্রযুক্তিকে ব্যবহার করা হয়। উন্নতর প্রযুক্তির মাধ্যমে এই পর্যায়ের কম্পিউটার ভ্যাকুয়াম টিউবের বদলে ট্রানজিস্টর লাগানো হয়। এই কম্পিউটার গুলিকে যন্ত্র হিসাবে আকারে তুললনামূলকভাবে ছোট বলা হয়।

এখন দেখা যাক দ্বিতীয় প্রজন্মের কম্পিউটারের কী কী সুবিধা ছিল, প্রথমত, এগুলি আকারে ছোট, দ্বিতীয়ত, প্রথম প্রজন্মের কম্পিউটারের তুলনায় এগুলি বেশি নির্ভুলভাবে কাজ করত। তৃতীয়ত, চালু অবস্থায় এগুলি থেকে কমতাপ বেরোত। চতুর্থত, এই কম্পিউটারগুলি তথ্য বিন্যাসের কাজে দ্রুত ছিল। পঞ্চমত, এগুলির হার্ডওয়্যার ব্যবস্থাও বিকল হত কম।

তবে এর আবার কিছু অসুবিধা ও লক্ষণীয়। প্রথমত, এগুলির ব্যবহারের জন্য শীততাপ নিয়ন্ত্রক দরকার পড়ত। দ্বিতীয়ত, এগুলি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অল্প সময়ের ব্যবধানে বারবার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হত। তৃতীয়ত, এগুলির উৎপাদন পদ্ধতি ছিল বেশ জটিল এবং ব্যয়বহুল।

তৃতীয় প্রজন্মের কম্পিউটার (১৯৬৪-১৯৭৫)

বিবর্তনের পথ ধরেই নিরন্তর গবেষণার মধ্য দিয়ে আরও উন্নত প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটালো তৃতীয় প্রজন্মের কম্পিউটার। দ্বিতীয় প্রজন্মের কম্পিউটারে ব্যবহার করা হয়েছিল ট্রানজিস্টর। তৃতীয় প্রজন্মের কম্পিউটারে তার জায়গায় ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (আই. সি.) যা সাধারণত সিলিকণের একটিমাত্র টুকরোর উপরে তৈরি ক্ষুদ্র স্থানে সীমাবদ্ধ বিদ্যুৎ সঞ্চালনের চক্র। যে প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে আই. সি. র এই ব্যবহার তার নাম স্কেল ইন্টিগ্রেশন (এল. এস. আই) টেকনোলজি।

দ্বিতীয় প্রজন্মের কম্পিউটারের তুলনায় আরও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের কারণে তৃতীয় প্রজন্মের কম্পিউটারে অসুবিধার মাত্রা খুব কম। সুবিধাই অনেকটা বেশি। প্রথমত, তৃতীয় প্রজন্মের কম্পিউটার ছিল আকারে ছোট।

দ্বিতীয়ত, এগুলি আরও বেশি বিশ্বাসযোগ্যতার সঙ্গে কাজ করত। তৃতীয়ত, এগুলি ব্যবহারের সময় কম তাপ উৎপন্ন হত। চতুর্থত, এগুলি তথ্য বিন্যাসের কাজ দ্রুত করতে পরত। পঞ্চমত, এগুলি রক্ষণাবেক্ষণের খরচ ছিল কম। ষষ্ঠত, এই কম্পিউটার গুলি ছিল বহন যোগ্য অর্থাৎ সহজেই এগুলি এক জাগয়া থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হত। সপ্তমত, এগুলি চালাতে কম বিদ্যুৎশক্তির প্রয়োজন হত। অষ্ঠমত, এগুলির বাণিজ্যিক উৎপাদন ছিল তুলনামূলকভাবে সহজ ও এর খরচ ছিল কম।

চতুর্থ প্রজন্মের কম্পিউটার (১৯৭৫ ও তার পরবর্তী সময়)

তৃতীয় প্রজন্মের এল. এস. আই প্রযুক্তির জায়গায় চতুর্থ প্রজন্মের কম্পিউটারের ব্যবহার করা হলো ভেরি লার্জ স্কেল ইন্টিগ্রেশন টেকনোলজি বা ভি. এস. এল. আই প্রযুক্তি। এই প্রযুক্তির ভিত্তিতে কম্পিউটারে বসানো হল মাইক্রো প্রসেরর। স্বভাবতই এর ব্যবহারিক সুবিধা বেড়ে গেল অনেক গুণ। প্রথমত, এই কম্পিউটারের উৎপাদন ব্যয় অনেকটা কমে গেলো। দ্বিতীয়ত, এগুলি তথ্য বিন্যাসের ভূমিকা পালনের প্রশ্নে খুবই দ্রুত গতিসম্পন্ন। তৃতীয়ত, এগুলির স্মৃতিশক্তি খুব জোরালো অর্থাৎ এই কম্পিউটার

গুলি তাদের স্মৃতি বা মেমোরিতে এক সঙ্গে বিশাল পরিমান তথ্য ধরে রাখতে পারে। চতুর্থত, এগুলি আকারে বেশ ছোট। পঞ্চমত, এগুলি চালাতে কম বিদ্যুৎ লাগে। ষষ্ঠত, এযাবত আলোচিত চারটি প্রজন্মের মধ্যেই এই প্রজন্মের কম্পিউটার গুলিই দামের দিক থেকে সবচেয়ে সস্তা।

পঞ্চম প্রজন্মের কম্পিউটার

বিজ্ঞানীরা এখন পঞ্চম প্রজন্মের কম্পিউটারের তৈরির কাজে ব্যস্ত, চলেছে আরও উন্নত ও পরিমার্জিত প্রযুক্তি উদ্ভাবনের গবেষণা। ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে অপটিক ফাইবার প্রযুক্তির প্রয়োগ। মনে রাখতে হবে, মানুষের মেধার স্বকীয়তা আছে। কম্পিউটারের কিন্তু তা নেই। কম্পিউটারকে মেধা সম্পন্ন করে তুলতে হবে। তাই কম্পিউটারের মেধা কৃত্রিম মেধা। এই মেধা ও তার ব্যবহারকে অপটিক্যাল ফাইবার ও অন্যান্য প্রযুক্তির সাহায্যে কত তীক্ষ্ণ ও দক্ষ করে তোলা যায়, পঞ্চম প্রজন্মের কম্পিউটারে চলছে তারই পরীক্ষা নিরীক্ষা।

আধুনিক কম্পিউটারের শ্রেণি বিভাগ : তথ্য বিভাগের পদ্ধতির ভিত্তিতে কম্পিউটারকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। এগুলি হল—

(ক) ডিজিটাল কম্পিউটার

(খ) অ্যানালগ কম্পিউটার

(গ) হাইব্রিড কম্পিউটার

ক্ষমতার ভিত্তিতে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়। যথা—

(১) সুপার কম্পিউটার

(২) মেইনফ্রেম

(৩) মিনি কম্পিউটার

(৪) মাইক্রো কম্পিউটার

(৫) পার্সোনাল কম্পিউটার (পি. সি)

সৃষ্টিনাশা

হৃষিকা নন্দী
(সেমিস্টার-তৃতীয় বর্ষ (পুষ্টি ও বিজ্ঞান), রোল নং ৬৬২)

জয় গোস্বামীর লিখিত 'নুন' কবিতা। সমাজের খেটে খাওয়া গরিব শ্রেণির মানুষের কবিতা। অদ্ভুতভাবে এই করোনাকালীন অনেক নিম্নবিত্ত পরিবারের নিত্য ঘটনার সঙ্গে রয়েছে হুবুহু মিল। এই কবিতায় স্থান পেয়েছে তাদের দুঃখের কথা, তাদের অভাবের কথা। করোনা কালীন সময়ে দাঁড়িয়ে স্বাস্থ্য ভিত্তিক সমস্যার পর কিছু থেকে থাকে তা হল আর্থিক সমস্যা। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে মানুষের বেশি চাওয়া পাওয়া নেই। তারা অল্পেতেই খুশি। তাদের নেই কোনো অভিযোগ অনেক বেশি কিছু পাওয়ার, শুধু একটা স্বাস্থ্যবান জীবন আর তাদের শিশুদের পেটে দু-বেলা দু-মুঠো ভাত, আর সামান্য নুন। এদের জীবন অতি সাধারণ। এরা সম্পূর্ণদিন মহামারীর সঙ্গে জীবন মরণ যুদ্ধ করে যা উপার্জন করে তাতেই তাদের সংসার চলে। অনেকদিন যাবৎ এরা অনেক কিছু ক্রয় করতে পারে না, এমনকি তাদের স্বাস্থ্য সম্মত জিনিসগুলো ও তাদের আর্থিক অসচ্ছলতার কারনে তাদের বাড়ি ফিরতে হয় অনেক কিছু না নিয়ে, কিছু কিছু সময় কাল দুবেলা দুমুঠো ভাত জুটবে কিনা সেই চিন্তা মাথায় নিয়ে ।

যদিও তাদের অভাবে অসুখেভুগে কিন্তু তাদের নেশা থেমে থাকে না। এই সময় দাঁড়িয়ে আমরা অনেকেই তা দেখেছি ও পড়েছি। আর্থিকভাবে সচ্ছল না হলেও তাদের বিলাসিতা করার ইচ্ছে হয়। তাদের ইচ্ছে হয় কখনো বা একটি গোলাপ ফুলের চারা লাগানোর, কখনো বা ইচ্ছে হয় ভালো সময় কাটানোর, কিন্তু সুযোগটাও তাদের কাছে নেই।

অভাবের টানে তারা অনেক সময় ঠান্ডা ভাতে নুন টুকুও পায় না। এরপরই শুরু হয় উৎপাত এবং সেই উৎপাতের শব্দ শুনতে পায় সমস্ত পাড়ার মানুষ। কিন্তু এতে তাদের কোন লজ্জা বোধ হয় না কারণ কেউই তাদের কথা ভাবে না, দু-বেলা ভাত পেটে পড়বে কিনা সেটাও ভাবে না। তাদের জীবিকাযাপনের নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও কেউই তাদের দেয়নি, এমনকি সরকারের কাছ থেকেও তারা সমস্ত সুযোগ সুবিধা পায় না, হয়তো বা পেলেও তা তাদের কাছে এসে পৌঁছায় না। তাই তাদের কাতর অবেদন এই যে, ''তাদের ভাত ও নুনের ব্যবস্থা হোক'' ''শান্তিতে জীবন কাটাতে দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হোক।''

অর্থাৎ তাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের অভাব ঘুচিয়ে যাক। কোনো পরিবার-ই যেন স্বাস্থ্য ভিত্তিক কারণে ও খাদ্যের অভাবে পরিজনদের না হারায়।

মহামারীর এই কঠিন সময় তারা যা পেয়েছে এবং হারিয়েছে সমস্ত কাটিয়ে এবং গুছিয়ে সবাই তাদের স্বাস্থ্যকর সুস্থ্য জীবন ফিরে পাক।

দরজার আড়ালে

তিয়াশা চৌধুরী
(রোল নং ৪৪৮, সমাজতত্ত্ব (অনার্স), পঞ্চম সেমিস্টার)

৩৬ বছরের বিবাহিত জীবন, ১৬ বছর বয়সে বাবা দেখেশুনে একজন সরকারি কর্মরত মাঝবয়সী ব্যক্তির সঙ্গে বিয়ে দেন। সেই বয়স থেকে আজ অবদি সংসারের হাল আমায় হাতেই। ছোটো সংসার শ্বশুর-শাশুড়ি আর স্বামী আর আমার 'অপূর্ব' অর্থাৎ আমার ছেলে অপূর্ব। বিয়ের পর থেকে সংসারের যাবতীয় সব দায়িত্ব, আমার নিজের হাতে।

আজ বহু বছর পর ছাদের পাশের ছোট্টো চিলেকোঠার ঘরে এসেছি। বহু বছর ঘরটি খোলা হয়নি তার চারিদিকে অদ্ভুদ চাপা গন্ধে ভরে আছে। চারিদিকে ধূলো, ময়লা মাকড়শার জাল, কীট আরো কত কি। শাশুড়ি পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন এই মাত্র ২০ দিন হল, তাই আবার এই ঘরে আসার সুযোগ পেলাম। সংসারের চাপে, শাশুড়ির বারণের মাঝে যে কোথায় হারিয়ে গিয়েছিলাম তা নিজেও বুঝতে পারিনি।

যাইহোক, এই ঘরটি আমার জীবনে যে কোন স্থানটি দখল করে আছে তা আমি কোনোদিনও কাউকে বুঝিয়ে বলতে পারবো না। আমার ভালোবাসা, আমার স্বপ্ন, আমার ছেলেবেলার স্মৃতি এই ঘরে ধূলো, ময়লার আস্তরণের পিছনে চাপা পড়ে আছে। ছোটো বয়সে বিয়ে করে সংসারে চলে এসেছিলাম প্রিয় কিছু পুতুল, একটি সাহিত্যের বই, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দেবী চৌধুরাণী' আর 'বিষবৃক্ষ' আর সাথে আমার পছন্দের সবচেয়ে প্রিয় তানপুরা। খুব পছন্দের ছিল সেই তানপুরাটি আমার জীবনে। বাবা-মায়ের একটি মাত্র সন্তান হওয়ার দরুন, ছোটো থেকে গান-বাজনা, পড়াশুনা শিখেছিলাম। বাবার আশা ছিল বড়ো হয়ে আমি গায়িকা হব। তাই তাঁর সাধের তানপুরাটি আমাকে দিয়েছিলেন।

বিয়ের প্রথম মাস সেই তানপুরাটি কাছে পেলেও কিছুদিন পর সেটির জায়গা হয়ে ওঠে চিলোকোঠার অন্ধকারে। শাশুড়ি আমার পুতুল খেলা পছন্দ করতেন না। যেই বয়সে আমার পুতুল খেলার, লুকোচুরি খেলার বয়স ছিল, সেই বয়সে হেঁসেল ঘরবাড়ি সামলেছিলাম। এইভাবেই কেটে গিয়েছিল জীবনের মূল্যবান দিনগুলি, স্বপ্ন দেখতে পারিনি, সংসারে জাতাকলে পিশে মরেছি।

বিয়ের সাত বছর পর আমার সন্তান, আমার খোকা আমার পেটে আসে, তার আগে বুঝতেই পারিনি জীবনে সুখ এবং শান্তি কি, কখনো না খেয়ে, কখন স্বামীর মার, শ্বশুরের কটু মন্তব্য আর শাশুড়ির কথাতো বললাম না, সারাজীবন সহ্য করেছি।

যাইহোক আমার নাম 'কোমল' বাবা গান—বাজনা ভালোবাসতেন, তাই ভালোবেসে আমার নাম 'কোমল' রেখেছিলেন, সপ্তক সুরের রাগী স্বরকে কোমল বলে, কিন্তু কি হবে বলুন, সংসারের মায়ায় হারিয়ে ফেলেছি নিজের স্বরকে, নিজের স্বপ্নকে, হারিয়ে ফেলেছিলাম নিজের শৈশব।

এখন ছেলে আমার ২৯ বছরের সদ্য বিবাহিত। এবার ভেবেছিলাম আমার জীবনের দুঃখের দিন শেষ, নিজের সন্তান এবং তার স্ত্রী তাদের একমাত্র দুই মাসের ছোট্টো পরী (নাতনি)-কে নিয়ে, তাদেরকে ঘিরে নিজের জীবনের সুখকে আমন্ত্রণ করবো। কিন্তু না... ভগবান হওতো চাননি আমি সুখ পাই।

হ্যাঁ জানি আপনারা বিরক্ত হচ্ছেন, আমার এই জীবন কাহিনী শুনে, তবে বিশ্বাস করুণ আমার মতো হাজার হাজার 'কোমল', হাজার নারী এই দুঃখ কষ্ট, মানসিক-শারীরিক অত্যাচারের শিকার, বিয়ের পর যাদেরকে নিজের মাতা-পিতার আসনে বসিয়েছিলাম, আর যাকে ভালোবেসে, শ্রদ্ধা দিয়ে ভগবানের আসনে বসিয়েছিলাম, যার বুকে মাথা দিয়ে শান্তি খুঁজে পেতে চেয়েছিলাম, এবং যাকে ১০ মাস ১০ দিন পেটে ধারণ করে তিলে তিলে বড় করেছিলাম আসলে এরা কেউ-ই আমার নিজের হয়ে উঠতে পরেনি বহু প্রচেষ্টা করেও, আদর্শ স্ত্রী, আদর্শ 'মা' হয়ে উঠতে পারিনি আমি। আচ্ছা আপনারা কেউ বলতে পারবেন? কিভাবে আর কেমন করে আদর্শ হয়ে উঠতে পারবো সংসারে! শুধুতো একটু সুখ চেয়েছিলাম, আর শান্তি, নিজের সখ-আল্লাদ, স্বপ্নকে বিসর্জন দেওয়ার পরেও পাইনি আমি। মা-বাবা যাদের বাড়িতে পাঠিয়ে বলেন যে এটাই (শ্বশুরবাড়ি) আমাদের আসল বাড়ি, সত্যিই কি সেটা আমাদের নিজে বাড়ি হয়ে ওঠে।

আর এই প্রশ্ন কেবল আমার নয় শত, শত, নারীর প্রশ্ন যারা আমাদের মত অবস্থায় থাকেন, যাদের সংসারের নাম করে তাদের সংসারের যাতাকলে পিশে মারা হয়।

এ কেমন সমাজ যেখানে নারীদের সম্মান নেই, তাদের পরিচয় নেই, বাড়ি নেই, লতানো গাছের মতো তাদেরকে বট গাছকে উপেক্ষা করে বেঁচে থাকতে হয়। ভদ্রলোকের মুখোস পড়ে কোমলের মতো নারীদের দরজার পিছনে অত্যাচার করা হয়।

সত্যিই কি আসবে সেই দিন যেই দিন তাদের আর কষ্ট সহ্য করতে হবে না, তাদের স্বপ্ন ভাঙবে না সংসারের বাকি সদস্যদের মতো মাথা উঁচু করে বাঁচাবে।

হ্যাঁ আসবে সেই দিন একদিন, যেই দিন সব মহিলারা চিৎকার করে বলবে,

"বাঁচতে দাও, বাঁচতে চাই, সম্মান চাই
পরিচয় চাই, বাঁচতে দাও বাঁচতে চাই"

Anxiety Disorder

Manisha Chatterjee
(Human Development (Hons), 3rd Semester, Roll-546)

Definition

A mental health disorder characterised by feelings of warry, anxiety or fear that are strong enough to interfere with one's daily activities.

Types of anxiety disorders

There are several types of anxiety disorders, including :

(i) Panic disorder
(ii) Social anxiety disorder
(iii) Obsessive-Compulsive disorder
(iv) Psot-treaumatic stress disorder
(v) Generalized Anxiety Disorder
(vi) Specific phobias
(vii) Separation anxiety disorder

Symptoms

Anxiety can trigger symptoms like :

* excessive fear and worring * agitation * restlessness * panic * irritability * irrational fear of danger * racing thoughts * shortness of breath or rapid breathing * sleep issues * headache and stomachache * pounding heart * insomnia * trembling * muscle tension * sweating * feeling weak or tired.

Causes

Anxiety disorders are like other forms of mental illness. They don't come from personal weakness, character flaws or problems with upbringing. But researchers don't know exactly what causes anxiety disorders. They suspect a combination of factors plays a role :

(i) Chemical imbalance-Severe or long-lasting stress can change the chemical balance that controls your moods. Experiencing a lot of stress over a long period can lead to an anxiety disorder.
(ii) Environmental factors-Experiencing a trauma might trigger an anxiety disorders, especially in someone who has inherited a higher risk to start.
(iii) Heredity— Anxiety disorders tend to run in families. You may inherit them from one or both parents, like eye colour.

(iv) Drug withdrawal or misuse : Certain drugs may be used to hide or decrease certain anxiety symptoms. Anxiety disorder often goes hand in hand with alcohol and substance use.

Treatment of anxiety disorders

Medications can't cure an anxiety disorder. But they can improve symptoms and help you function better, Medications for anxiety disorders often include :

(i) Anti anxiety medications—Such as benzodiapines, may decrease your anxiety, panic and worry. That work quickly, but you can build up a tolerance to them. They makes them less effective over time. Your heatthcare provider may prescribe an anti-anaxiety medication for the short-term, then taper you off or the provider may add an antidepressant to the mix.

(ii) Antidepressants—Can aslo help with anxiety disorders, They tweak how your brain uses certain chemicals to improve mood and reduce stress. Antidepressants may take some time to work, so be patient. If you feel like you're ready to stop taking antidepressants, talk to your provider first.

(iii) Beta-blockers—Usually used for high blood pressure, can help reduce some of the physical symptoms of anxiety disorders.

Reference

www.may.cleveland/clinic.org

www.hhs.gov

www.webmd.com

অন্তত

শ্রীতম রায়
(Geography (Hons), 1st Semester, Roll No.-580)

সায়নের আজ কোনো ক্লাসের মন নেই। এমনিতে স্কুলে সায়ন রোজই পড়া পারে, কিন্তু আজ যেন হারিয়ে গেছে অন্য কোথাও। সকাল থেকেই জানলায় দিকে চেয়ে বসে আছে।

টিফিনের ঘন্টা পড়তেই পাশে বসে থাকা সৌম্য বলে উঠল—'তোর আজ কি হয়েছে রে?

তখনো সায়ন আনমনা হয়ে চেয়ে রয়েছে বাইরের দিকে। শরতের সোনালী রোদ এসে ওর চুলে যেন নরম হাতের পরশ লাগিয়ে দিচ্ছিল।

সৌম্য আবার ডাকে—'কি-রে সায়ন, টিফিন খাবিনা?' সায়ন এবারেও চুপ। একটা কান্না মাখানো দীর্ঘশ্বাস যেন ওর বুক ঠেলে বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইল। সৌম্য বলে—'চাউমিন এনেছি সায়ন খাবি?'

এবার হয়তো সায়ন আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলো না, কান্না মাখানো গলায় বলে উঠল—'দিল্লি অনেক দূর রে, অনেক দূর!' সৌম্য অবাক।

সায়ন আবার বলে—'আকাশের নীল আস্তরন ভেদ করে মাঝে মাঝে অনন্তের হাতছানি আসে। পৃথিবীর বুক থেকে ছেলে মেয়েরা চঞ্চল হয়ে ছুটে গিয়ে, সেই অনন্ত নীলিমার মধ্যে ডুবে নিজেদের হারিয়ে ফেলে। পরিচিতি পথের বহুদূর পরে কোনো অচেনা, অজানা পথে, আমার অশান্ত চঞ্চল প্রাণের বেলায়, জীবনের সেই সর্বাপেক্ষা বড়ো ডাক এসে পৌঁছেছে রে।'

সৌম্য হতবাক হয়ে বলে ওঠে—'কি বলছিস তুই এসব? এতো পথের পাঁচালীর লাইন। সায়ন বলে—'চলে যাচ্ছি যে, সব ছেড়ে, এই স্কুল ছেড়ে, এই শহর ছেড়ে, হয়তো, এই পৃথিবী ছেড়ে।

সৌম্য রেগে ওঠে—'মুখে যা আসে তাই বলছিস!'

—না রে, সত্যি। আমার রক্তে ক্যানসার ধরা পড়েছে। ডাক্তার বলছে, আমার জীবনের মেয়াদ আর বেশিদিন নেই। চিকিৎসা করেও কোনো বিশেষ লাভ হবে না।—বাবা তবুও শেষ চেষ্টা করছে, চিকিৎসা করাতে দিল্লি চলে যাবে। তবে মনে হয় না প্রাণ নিয়ে আর ফিরতে পারব।

কিছুক্ষণ নিরবে কেটে যায়। সায়নের মুখে এমন কথা সত্যিই সৌম্যর কাছে একেবারে অপ্রত্যাশিত ছিল।

সৌমের গলা ধরে আসে। চোখের জল সংবরণ করতে না পেরে বলে ওঠে— কে বলেছে তুই চলে যাবি? তুই...তুই আমাকে ছেড়ে চলে যেতে পারবি?' ম্লান মুখে চেয়ে থাকে সায়ন;

—'স্কুল শেষে একসাথে বাড়ি ফেরা, গঙ্গার ধারে চায়ের দোকানে একসঙ্গে চা খাওয়া, রোজ ভোরে উঠে মাঠে ক্রিকেট খেলা, বিকালে 'রায়ঘাট' বা কখনো 'কলেজ-মাঠে' বসে কবিতা লেখা। পুজোতেও একসাথে ঘোরা... এসব ছেড়ে, আমাকে একা করে দিয়ে তুই চলে যাবি?' সায়ন চুপ। গাল বেয়ে কয়েক ফোঁটা চোখের জল বেঞ্চের উপরে পড়ে, রোদের আলোয় মুক্তোর মতে চকচক করছে।

সৌম্য আবার বলে—'পুজোতে আর একসাথে রাজবাড়ি যাওয়া হবে না? মাঝ গঙ্গায় সাঁতার কেটে চড়ায় গিয়ে কাদা মেখে আর ফুটবল খেলা হবে না? পড়া শেষে রাতে গঙ্গার ধারে বসে নিকষ গঙ্গার

জলটা আর দেখা হবে না? যতই বলছে, যতই মনে পড়ছে ততই তাদের মন স্মৃতির ভাবে নুইয়ে পড়ছে।

স্কুল শেষে বিকেলে অনেকক্ষণ তারা একসাথে বসে রইল গঙ্গার ধারে। সন্ধ্যে হয়ে আসছে, সূর্য পশ্চিম দিগন্তে ডুব দিতে দিতে চারিদিকে তার আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে। আকাশে লাল হলুদ কমলার একটা আভা ছড়িয়ে পড়েছে। যেন মনে হয় আকাশটা কোনো একটা ক্যানভাস, আর কোনো শিল্পী তুলির টান দিতে দিতে, তার ভাবনা শক্তিকে অসীমে নিয়ে চলে গেছে। শ্রীরামপুরের সেন্ট ওলাভ্ চার্চ দাঁড়িয়ে আছে কত ইতিহাসকে সাক্ষী করে, আর কতভাবে প্রত্যক্ষ করছে বর্তমানকে। ধীরে ধীরে অন্ধকার নেমে আসছে গঙ্গার সে বহমান জলের ওপর। লাইট গুলো জ্বলে উঠলো। গঙ্গার উল্টো পাড়ের আলোর ছায়াগুলো গঙ্গার বুকে আপতিত।

একটা নৌকা ছাড়ার শব্দে ওদের চেতনা ফিরল, এসব কিন্তু সায়নের কাছে আজ শেষ দেখা বলে মনে হয়।

সৌম্য বলল—'তবে কি আমাদের আর কোনো দিনও দেখা হবে না?'

সায়ন বললে—'বেঁচে থাকলে আবার হবে। আবার আমি ফিরে আসবো, গঙ্গার ধারে এই শ্রীরামপুর শহরে। আবারো আগের মতোই ঘুরবো, মজা করবো। কিন্তু তুই কথা দে, কাল যখন আমি চলে যাব, তখন যেন আমি তোর চোখে জল না দেখি, কথা দে।

—'না আমি পারবো না'। গলা ভারী হয়ে আসে সৌম্যর। 'পারবো না আমি'। বলে উঠে দাঁড়ালো সৌম্য। তারপর দু-হাতে নিজের মুখ ঢেকে এক দৌড়ে কোথায় জানি হারিয়ে গেল।

পরদিন সকালে সবাই স্টেশনে দেখা করতে এসেছিল। পাড়াই সবাই। স্কুলের কিছু বন্ধু। আসেনি শুধু সৌম্য। সায়ন ভাবলে, এত অভিমানী সৌম্য। ট্রেন আসলো। সকলের চোখে জল। শ্রীরামপুর ছেড়ে এক অজানা, অস্থায়ী ঠিকানায় পা বাড়ালো সায়ন আর পিছনে পড়ে রইল, ওর বন্ধুত্ব, শৈশব, ভালো মন্দ না জানি আরো কত কি!

আজও কাঁদে দুর্গা

ঈষা ঘোষ

(B. Com (Hons), 5th Semester, Roll- 190)

এখন শরৎকাল চারিদিকে দুর্গাপুজোর আমেজ। আজ মহালয়া, আজ থেকে মাতৃপক্ষের সূচনা হল আর পিতৃপক্ষের অবসান ঘটল। কিন্তু এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজে কী সত্যিই সমস্ত নারী মা দুর্গার মতো সমস্ত পাপীদের বিনাশ করতে পারে? তাদের শাস্তি দিতে পারে?

আমি কেন এই রূপ মন্তব্য করছি আপনারা আমার এই গল্পটি পড়ে বিচার করুন।

আজ থেকে ১০ দিন আগে এ্যাডভোকেট রোহিনী বাসু বাঁকুড়ায় তার মামা বাড়ি গিয়েছিল ঘুরতে। রোহিনী বাসু কোলকাতার একজন নামকরা ক্রিমিনাল বিভাগের উকিল। বাঁকুড়ায় গিয়ে রোহিনী বুঝতে পারেনি যে সে এক ভয়ানক ঘটনার সম্মুখীন হবে। এর আগেও সে নানারকম ঘটনার মোকাবিলা করেছে কিন্তু এই ঘটনাটি তাকে একদম অন্য এক ধরনের শিক্ষা দিয়েছে।

সেখানে গিয়ে রোহিনীর সাথে পরিচয় হয় গিতা নামে একটি মেয়ের। এই মেয়েটির মা রোহিনীর মামা বাড়িতে দীর্ঘদিন যাবত কাজ করে। সেই সূত্রেই গিতার সঙ্গে রোহিনীর আলাপ হয়। মেয়েটি খুবই মিষ্টি ও মিশুকে স্বভাবের। গিতা দরিদ্র হলেও সেছিল খুবই সৎ, মেধাবী ও সাহসী প্রকৃতির। তার এই দিকগুলোই রোহিনীকে তার দিকে আকৃষ্ট করেছিল। গিতা বুঝতে পারেনি যে তাকে আর এই প্রতিবাদী দিকটার জন্য অনেক বড়ো মূল্য দিতে হবে। গিতা সেই অন্যায় যার প্রতিবাদ করেছিল সেই অন্যায়টি কি ছিল আপনারা জানেন? একদিন গিতা ও তার বান্ধবীরা কলেজ থেকে বাড়ি ফিরছিল সেই সময় রাস্তায় গ্রাম পঞ্চায়েত বিমল কর-এর ছেলে ভিকি ও তার কিছু বখাটে বন্ধুরা মিলে গিতা ও বান্ধবীদের অশ্লীল ভাষায় কটুক্তি করেছিল। গিতার বান্ধবীরা ভয় পেয়ে কিছু না বলেও সে তার নিজের এবং তার বান্ধবীদের সম্মান রক্ষার্থে প্রতিবাদ করেছিল এবং ভিকিকে সকলের সামনে চড় মেরেছিল। এই ঘটনায় ভিকি খুবই রেগে যায় এবং সে সকলের সামনে গিতাকে বলে যে সে এর প্রতিশোধ নেবে। এই ঘটনার পর থেকে গিতা ও তার পরিবারকে গ্রাম প্রধান এক ঘরে করে দিয়েছিলেন। এই ঘটনার ধাক্কায় গিতার মা ও বাবা দুজনেই অসুস্থ হয়ে পড়ে। একদিন রাতের বেলা গিতার মা হঠাৎ খুবই অসুস্থ হয়ে পড়ে তাই ওযুধ আনতে গিতাকে শহরে যেতে হয়েছিল। ঘড়ির কাটায় যখন ১২ টা ১০ মিনিট গিতা তখন একটি ভ্যান ভাড়া করে এসে গ্রামের পুকুরে নামে। একেই গ্রাম, তার ওপর হালকা শীত পড়েছে। তাই গ্রামের রাস্তায় কোনো লোকজন নেই। তাই ও হেঁটে হেঁটে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিল। ওই রাতে গিতার ওপর প্রতিশোধের লোভে ঝাঁপিয়ে পরে ভিকি ও তার বন্ধুরা। তারা প্রতিশোধের নাম করে গিতাকে প্রথমে ধর্ষণ করে এবং তারপর তার মুখের ওপর অ্যাসিড ছুঁড়ে মারে। সেদিন হয়তো কেউ গিতার চিৎকার শুনেও শোনেনি, গিতার ওপর চলতে থাকে নির্মম অত্যাচার। বর্তমান সময়, কালকে রোহিনী এই কারণটির জন্য কলকাতায় ফিরে এসেছিল। আমি আমার লেখার শুরুতেই সেই মেয়েটির ওপর হওয়া অন্যায়-এর কথা বলেছিলাম সেই গিতাই হল আজকের সমাজের নির্যাতিতা। কালকে কোর্টে রোহিনী গিতার কেসটা উপস্থাপনা করেছিল। কিন্তু শত চেষ্টার পরেও শুধুমাত্র টাকা, মানুষের লোভ-লালসা

এবং স্বাক্ষী ও প্রমাণের অভাবে গিতার মতো একটি নিষ্পাপ-নির্দোষ মেয়ে তার প্রতি হওয়া অন্যায়-এর সুবিচার পায়নি। এই লড়াইটা ছেড়ে গিয়ে গিতার পাশাপাশি রোহিনী ও খুব ভেঙে পড়ে।

তারপর আজ মহালয়ের পূণ্য তিথিতে রোহিনী তার স্বর্গীয় পিতার শান্তি কামনার উদ্দেশ্যে গঙ্গায় তর্পণ করতে গিয়েছিল। তখন ফেরার পথে সে শুনতে পায় গঙ্গায় কে যেন আত্মহত্যা করেছে। সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা নানা লোকে নানা কথা বলছে। কেউ কেউ বলছে যে মেয়েটা প্রেমে ধোঁকা খেয়ে নিজের জীবন দিয়েছে। তাই সে দেখার জন্য এগিয়ে গিয়ে দেখে যে গিতার দেহটা কয়েকজন মিলে জল থেকে উপরে তুলছে। এই দৃশ্যটি দেখে রোহিনী কোনো মতে নিজেকে সামলে বাড়ি ফিরেছে।

তাই এই ঘটনাটি শুনে আমার মনে একটাই কথা এসেছে যে আজ মহালয়া থেকে দেবীপক্ষের শুরু কিন্তু এই মহালয়ের শুরুতেই আমাদের সমাজের জ্যান্ত দুর্গা তার জীবন শেষ করে দিল। আমাদের সমাজের এই রকম অনেক মেয়ে আছে যারা নিজের প্রতি হওয়া অন্যায়ের সুবিচার পায় না। কিন্তু আমাদের এই সমাজের দেবী দুর্গা যে কিনা সমস্ত নারী জাতির প্রতীক সেই দেবীকে নিষ্টার সাথে পূজো করা হয়। কিন্তু সেই নারীর উপর নির্যাতন ও অত্যাচার করার সময় সেইসব অসুররূপী মানুষদের মনে থাকে না যে সেই নারীই কিন্তু মা দুর্গার রূপ।

তাই এই সমাজে যেদিন সমস্ত নারী গিতার মতো পদক্ষেপ গ্রহণ না করে দেবী দুর্গার মতো অসুর নিধনে রণে অবতীর্ন হবে সেদিন এইসব অসুর রুপী মানুষের পার পাবে না।

উপসংহার : তাই নারীকে দুর্বল, অবলা, নিরীহ ভাবা ভুল। সমস্ত সমাজকে মনে রাখতে হবে এক নারীর হাতেই কিন্তু অসুর কূলের বিনাশ হয়েছিল।

মায়ার বাঁধন

অনির্বাণ মুখার্জী

(মানব উন্নয়ন বিভাগ, ৩য় সেমিস্টার, রোল-৫৪৩)

ঘন্টু মারা গেছে আজ পাঁচদিন হলো, আজও ভুলে বাড়ি ফেরার পথে ওর জন্য কলমি শাক কিনে ফিরছিলাম তার পর হঠাৎ মনে পড়লো আমার প্রিয় খরগোশ ঘন্টু তো মারা গেছে পাঁচদিন আগে। আসলে মায়ার বাঁধন! যাইহোক আমি অনির্বাণ বর্তমানে কলেজ পড়ুয়া। বরাবরই আমার মানুষদের থেকে পশুপাখিদের সাথে বন্ধুত্ব বেশি। একদিন শীতের রাতে হঠাৎই ঘন্টুকে আমি খুঁজে পাই আমার স্কুলের পাশের মাঠ থেকে, প্রথমে তুলোর বল ভেবে ভুল হয়েছিল। সেদিনকার মতো বাড়ি নিয়ে যাই পরে খোঁজ করেও ওর আগমন সম্পর্কে কিছু জানতে না পেরে ওকে আমার কাছেই রেখেদি। ব্যাস সেদিন থেকেই আমরা একে অপরের সহচর। নাম রাখি তার ঘন্টু। আমরা বেশিরভাগ সময়ই একসাথে থাকতাম, শীতে ছাদে রোধ পোহানো, বৃষ্টির দিনে আমার মুড়ির বাটি থেকে ভাগ বসানো, আমার গল্পের বইয়ের দফারফা করা আর আমার পুরো ঘরে উড়ে বেড়াত তার সাদা লোম। এসবই ছিল তার কার্য তালিকার শীর্ষে। এভাবেই দেখতে দেখতে কেটে গেল ছয়টা বছর তারপর, নাহ আসলে তার আর পর নেই মানে একদিন হঠাৎই কাউকে না জানিয়ে পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে, আমার মায়া কাটিয়ে ঘন্টু চলে গেল সারা জীবনের মতো না ফেরার দেশে। ঘন্টুর কথা মনে পড়তে অজান্তেই চোখের কোনায় জল এসে গেল। ততক্ষনে বাড়ির সামনে এসে গেছি, হাতের শাকের আঁটি ফেলে দিয়ে ঘরে ঢুকলাম, নাহ আসলে ওটা নিয়ে ঘরে ফেরার সাহস আমার এখনো হয়নি। সারা বাড়ি জুড়েই ওর অসংখ্য চিহ্ন এখনো বর্তমান। আগামীকাল থেকে আমার পরীক্ষা কলেজে, আর আমি সেই সব ছাত্রদের মধ্যে পড়ি যারা শুধু পরীক্ষার আগেরদিন পড়ে পাস করে এক কথায় ফাঁকিবাজ আরকি। কাজেই পড়তে বসে গেলাম। আজ সারারাত পড়তে হবে, মা পাশের ঘরে খেয়ে শুয়ে পড়েছে। আমি পড়তে পড়তে কখন জানি না ঘুমিয়ে পড়েছি হঠাৎই ঘুমটা ভেঙে গেল একটা হালকা হিস-হিস শব্দে এবং টের পেলাম যে লোডশেডিং হয়েছে। ক্ষণিকের মধ্যেই আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল, আমাদের সাবেকী আমলের বাড়ি সঙ্গে লাগোয়া বাগান যা আজ পরিচর্যার অভাবে জঙ্গলে পরিণত হয়েছে আর সেখানে নানান সাপের আড্ডা তাই এই শব্দ যে তাদেরই সৃষ্টি তা আর আমার বুঝতে বাকি রইলো না। কাউকে ডাকতেও পারছি না বা উঠে পালাতেও পারছি না যেন এক গাঢ় অন্ধকারের সমুদ্র আমাকে গিলে খেতে আসছে। বইতে পড়েছিলাম স্লিপ প্যারালাইসিস অর্থাৎ এই অবস্থায় নাকি জেগে থাকলেও নরাচরা এমনকি কথা বলারও শক্তি হারায় মানুষ। আমিও সেই অবস্থায় এখন। মনে মনে প্রমাদ গুনছি এমতবস্থায় হঠাৎ ঘরের মধ্যে একটা ঝড় শুরু হলো যেন। দৃষ্টিতে আসছিল না কিছু কিন্তু অনুভব করতে পারছিলাম যে ঘরে কাদের মধ্যে যেন মরণ যুদ্ধ চলছে। এরকম ভাবে ঝটাপটি চললো বেশ কিছুক্ষণ। হঠাৎ ফোনের স্ক্রীনের আলোটা জ্বলে উঠলো আর অন্ধকারের চাদরে হাল্কা ফাটল ধরলো, আমি চকিতে দেখলাম একটা সাদা তুলোর বল সারাঘর জুড়ে লাফালাফি করে বেড়াচ্ছে। আমি ভালো করে দেখার আগেই সেই বল

আমার বুকের উপর আছাড় খেয়ে যেনো মিলিয়ে গেল শূন্যে, আমিও জ্ঞান হারালাম। নানান মানুষদের ডাকাডাকিতে ঘুম ভাঙলো, দেখলাম ঘরে বেশ লোক জড়ো হয়েছে, মা আমাকে উঠতে দেখে এগিয়ে এসে আমাকে বললো বাবু খুব বাঁচার বেঁচে গেছিস। আমার এবার আগের রাতের কথা ধীরে ধীরে মনে পড়তে শুরু করলো। আমি দ্রুত উঠে দেখলাম আমার খাটের পায়ার কাছেই একটা সাপ মরে পরে আছে, তার মুন্ডু ধর থেকে আলাদা এবং সারা ঘর সাদা লোমে ভর্তি আরো লক্ষ্য করলাম আমার পরনের জামাটারও একই হাল। কালাচ সাপ প্রচন্ড বিষধর! আস্তে আস্তে ভিড় ফাঁকা হলো, আমি আর মা দুজনই হয়তো আন্দাজ করতে পারছিলাম কাল কি ঘটে থাকতে পারে, আমার কিছু বলার আগেই মা বলে উঠলো, বুঝলি বাবু এ হলো মায়ার বাঁধন। আমি মনে মনে বললাম, সবই মায়া।

হাসি

বাস্তব বিশ্বাস

(ভূগোল অনার্স, রোল নম্বর ৫৮১, সেমিস্টার-১)

"তুমি হাসো, জগৎ তোমার সঙ্গে হাসবে—কাঁদলে একা কাঁদতে হবে"—এ কথা সত্য, হাসি আর কান্না মানুষের স্বাভাবিক আর আদিমতম প্রবৃত্তি। আনন্দে হাসি আর দুঃখে আমরা কাঁদি। হাসি আরও ব্যাপক শুধু সুখে নয় কৌতুকের আনন্দেও হাসি। আমার সুখে পাড়াপড়শী বা আত্মীয়-স্বজনের চোখ টাটাতে পারে, কিন্তু যেখানে কৌতুক আনন্দ সেখানে সকলেই সমপর্যায়ের। এ কৌতুককে আশ্রয় করে সাহিত্যে যে রসের সৃষ্টি হয় তার নাম হাস্যরস। সংস্কৃত অলংকারাণাস্ত্রের নবরসের এটি অন্যতম এবং অতি প্রাচীনকাল থেকে সাহিত্য ও সমাজে এর ব্যাপক প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। আমাদের সহজাত অসংস্কৃত হাসিটি শিল্পমার্জনায়, সামগ্রিক পরিবেশের সঙ্গে নিপুণভাবে মিশে খনি থেকে তোলা রত্নের মতো অপরূপ খ্যাতি অর্জন করেছে।

সাধারণভাবে মানুষের আচরণ ও চরিত্রে অসঙ্গতি আমাদের মধ্যে যে মৃদু উত্তেজক সৃষ্টি করে, তাতেই কৌতুক রসের সঞ্চার হয়। কিন্তু আমাদের সামনে দৃশ্যপট এত দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে, এত অসংখ্য রকমের অসঙ্গতি জীবনে দেখা দিয়েছে, বোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির বিপর্যয় আমাদের দিশাহারা করে দিচ্ছে যে কোনটা স্বাভাবিক কোনটা অস্বাভাবিক কোনটা ব্যতিক্রম, কোনটা সাধারণ নিয়ম তা সম্পর্কে আমাদের নিজেদের কোনো স্থির প্রত্যয় বা মানদন্ড নেই। তাই কাল ও সমাজের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যে হাস্যরস তাই সাহিত্যে গ্রহণ করা হয়েছে। উপলক্ষ্য বা উপাদান ভেদে হাসির রূপভেদ হয়। রহস্র, পরিহাস, ব্যাঙ্গ এগুলির মধ্যে যে সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে, যে হিসেবে আমাদের হাসিতেও বৈচিত্র্য দেখা যায়।

হাসির যতরকম ভাগ আছে তার মধ্যে 'হিউমার' শ্রেষ্ঠ। মানুষের জীবনের সব অসমাঞ্জস্য, আতিশয্য, মূঢ়তা, স্বার্থপরতা, অহঙ্কার, লোভ দেখে বিদ্বিষ্ট না হয়ে যদি সহানুভূতি নিয়ে তাকে সমালোচনা করা যায় তাকে হিউমার বলে। হিউমার স্রষ্টা মানুষের অসঙ্গতি, দোষ, অধঃপতন নিয়ে আলোচনা করেন বটে কিন্তু তিনি মনে জানেন তিনি তাদেরই একজন। হাসির যে একটি প্রধান কাজ আঘাত দিয়ে অসঙ্গতি সম্পর্কে সচেতন করানো। Homour-এর যে আঘাত তা প্রবল নয়। এর মধ্যে থাকে স্রষ্টার সহানুভূতি সঞ্জাত একটি করুণরস, তিনি জানেন ভুলভ্রান্তি অসঙ্গতি নিয়েই জগৎ। যাকে আপাতদৃষ্টিতে বুদ্ধিমান বিত্ত বলে মনে হয় তাদের মধ্যেও অসম্পূর্ণতা আছে—দোষাতীত কেউ নয়। হিউমার স্রষ্টার জীবন সম্পর্কে এ দৃষ্টিভঙ্গী তার অন্তরকে উদার, অপক্ষপাতী ও সমদর্শী করতে পেরেছে। সকলকে নিয়ে তিনি পরিহাস করতে পারেন কিন্তু কখনও উপহাস করেন না। হিউমারের মধ্যে যে কারুণ্য থাকে তার আতিশয্য হলে কিন্তু রসাভাস ঘটে। রবীন্দ্রনাথের উপমা মনে পড়ছে—মোটা লোক হঠাৎ আছাড় খেলে আমরা হাসি কিন্তু পড়ে গিয়ে পা ভাঙলে সেটা আর কৌতুকের বিষয় থাকে না-হয় দুঃখের।

Wit-এর উদ্ভব শব্দযোজনার ভঙ্গীতে বুদ্ধিদীপ্ত ও মার্জিত বাকচাতুর্য্যে। হিউমারে অভিজ্ঞতার প্রকাশ। উইট-এ পান্ডিত্যের বিকাশ। এর আবেদন আমাদের হৃদয়ের কাছে নয়, মস্তিষ্কের কাছে। হিউমার আমাদের আবিষ্ট ও আবির্ভূত করে—উইট বিস্মৃত ও চমৎকৃত করে।

Satire (ব্যাঙ্গরস)-এর হাসি আমাদের প্রসন্ন না করে বিষণ্ন করে তোলে। ব্যাঙ্গকার নির্মম। মানুষের ভুলত্রুটি দেখিয়ে তাকে অবহিত করা এবং তার শোধন করা সব হাস্যরসেরই উদ্দেশ্য কিন্তু ব্যাঙ্গের হাসিতে যোগ দিতে গিয়ে দেখি চাবুক আমারও পিঠে পড়ছে।

Satire (ব্যাঙ্গরস), Homour-এর বিপরীত। হিউমার লেখক সকলের মধ্যে থাকেন আর ব্যাঙ্গ লেখক নিজেকে উঁচুতে রেখে নিচের মানুষের অক্ষমতা ও দুর্বলতা দেখে হাসেন। উইট, স্যাটায়ার আর হিউমার উভয় জাতীয় রচনারই সাধারণ বাচনভঙ্গী। উইটকে ঠিক আলাদা জাতি বলা যায় না। সব হাসির রচনারই এটি সাধারণ উপাদান।

বিখ্যাত লেখকদের রচনা ছাড়াও সাধারণ মানুষ দৈনন্দিন জীবনে কথার সুরে, শব্দে, ভঙ্গীতে হাসির সৃষ্টি করে আনন্দ দিচ্ছে।

গল্পে শুনেছি এক ভদ্রলোককে উল্টো গেঞ্জি পরে আসতে দেখে এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল ‘‘বাবু আপনি আয়েন না যায়েন’—(আপনি আসছেন না যাচ্ছেন)। আরএকজন জিওল মাছ কিনতে গিয়ে মাছওয়ালাকে বারবার বলছেন মাছগুলো ভালো তো। জাইয়ে রামা যাবে তো। বিক্রেতা বললেন ‘‘বাবু আপনার ঠিকানা দিয়া যান—মাছ হাইট্যা হাইট্যা বাড়ি গিয়া উঠবো” (আপনার ঠিকানা দিয়ে যান মাছ নিজেই হেঁটে আপনার বাড়ি চলে যাবে) অর্থাৎ এও তা জীবনশক্তি আর অক্ষমতা। এর বাচনভঙ্গীর মধ্যে যা আছে তাতে যাকে আঘাত করা হলো তাকেও স্নিগ্ধ হাসির দ্বারা আপন করে নেওয়া হয়েছে।

কিন্তু সে বাকচাতুর্যও কশাঘাত করতে পারে—একজন গেছে আলপাকার কোট কিনতে। ক্রেতার গায়ের রং আবলুষা কাঠের মতো আর গায়ের লোমের অধিক। দোকানদারের অনেক পরিশ্রমের পর ক্রেতার একটি কোট পছন্দ হলো কিন্তু দরে আর মেলে না—দোকানদার যা দাম বলেন ক্রেতা তার অর্ধেকেরও কমে কিনতে চান। শেষে দোকানদার মনে মনে কি একটা হিসেব করে বললো ‘‘হইয়া যাইব বাবু, এর কমেই হইব। আপনি সামনের দোকান থিক্যা দুয়টা বোতাম আর একটু আঠা কিনেন। বোতামগুলি আঠা দিয়া থিক্যা পেট পর্যন্ত লাগাইয়া দিবেন—কেমন অল্প খরচে কোটের মধ্যে দেখাইবে।”—এ দিয়ে ক্রেতার রূপের অপ্রতুলতা আর কার্পণ্যকে বিদ্রূপ করা হয়েছে।

যে হাসিই হোক হাসি আমাদের অত্যন্ত উপকারী বন্ধু। আমাদের শরীরের, মনের জন্য, সমাজের জন্য এর প্রয়োজন অসীম। হাসি যদি আঘাত করে আমরা নিজেকে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নেবার চেষ্টা করি।

যে হাসে, হাসায় সে তো ভাগ্যবান। আর আমাদের আনাচে-কানাচে হাসি থিক্ থিক্ করছে—শুধু দেখবার ভঙ্গী আর ইচ্ছের অপেক্ষা। একজন রাগী কর্ত্তার গিন্নিকে বলতে শুনেছিলাম ‘‘কর্ত্তা রাগ করলে এমন দাঁত কড়মড় করে যে দেখে না হেসে পারিনে”—

মানব বিকাশ : আমার জীবনের অধ্যায়

কাহিনী ভট্টাচার্য্য

(মানব বিকাশ বিভাগ, রোল ৫৪১, ৩য় সেমিস্টার)

"মামনি কি নিয়ে পড়ছো?"

"Human development honours নিয়ে।"

"মানব বিকাশ? আমার কি কি বিকাশ হয়নি বলতে পারবি? হে হে হে হে হে!"

কখনো কখনো নীরবতাই শ্রেষ্ঠ উত্তর হয় এই সকল পরিস্থিতির জন্য। কারণ আমি বিকাশের যে স্তরে দাঁড়িয়ে সেটি নিছক বয়ঃসন্ধিকাল এবং প্রশ্নটি যিনি করেছিলেন তিনি একজন মধ্যবয়স্ক। এবং আমি চাইছিলাম না একজন ছোটো মুখে বড়ো কথার উদাহরণ হতে।

বিকাশ হল শিখন এবং পরিণমনের ফল। আমার নিরুত্তরতা যেমন তা শিখনের ক্ষেত্রে বাধাপ্রাপ্তি ঘটালো তেমনি তার জ্ঞানের বিকাশেও কৌতূহলের জিজ্ঞাসা চিহ্ন রেখে গেল।

মানুষের কৌতূহলের কোনো সীমা থাকে না। হা হয়ে জানলার দিকে ভ্যাবলার মতো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ভাবতে থাকি নিজের ভবিষ্যতের কথা। কারণ সেটি শুধু আমাকেই ভাবতে হবে। নিজের সন্তানের নামে রোজ প্রশংসা করা পাড়াপড়শি, বছরে একবার খবর নেওয়া আত্মীয়গণ, জন্মদিনের দিন খাবারের আশায় হঠাৎ উদিত বন্ধুরা শুধু একটা কথাই জানে—

"ওহ! Human development নিয়ে পড়ছিস? ওতে কিন্তু অনেক scope আছে।"

কিন্তু বিষয়টা কি এবং কিসে কিসে scope আছে তারা সেটিও জানে না এবং বিন্দুমাত্র আগ্রহ প্রকাশও করে না। সম্প্রতি B.SC এর যুগে B.A পড়া কিছু লোকের কাছে মাধ্যমিক না পেরোতেই বিয়ে করার সমান। তাই তারা শুধু সাইন্স না আর্টস এটুকু জিজ্ঞাসা করেই career counselling শুরু করে দেয়। তুমি engineering করলে তুমি চা-ওয়ালা, তুমি psychology নিলে তুমি পাগলের ডাক্তার, এইরূপ ধারণা তাদের।

তাহলে human development নিয়ে পড়লে কি হবো? আমার তো ইচ্ছা একজন counselor/therapist হওয়ার। তাছাড়াও researcher, health worker, psychologist, professor, social workers হওয়া প্রভৃতি অনেকরকম পেশা নির্বাচনের সুযোগ আছে। এবার আমি কোনটি হতে পারবো কিনা সেটি সম্পূর্ণটাই নির্ভর করছে আমার দক্ষতার ওপর। সবার আগে আমি চাই একজন মানুষের মতো মানুষ হতে।

বিষয়টি পুরোটাই বিজ্ঞান বিষয়ক এবং এটিকে জানতে হলে নিজেকে আগে ভালোভাবে জানা দরকার। নিজের জীবনের প্রত্যেকটা ধাপের সাথে মেলাতে হয় বিকাশকার্যের চেকলিস্ট। গর্ভাবস্থা থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর বার্ধক্য অবধি সময়কালে ঘটে যাওয়া সমস্ত পরিবর্তনের হিসাব রাখে এই বিষয়টি। এবং সব থেকে ভালো দিকটা হলো এই বিষয়টিকে বুঝতে সবসময় পাঠ্যবই লাগে না। আশেপাশের পরিবেশকে সদা পর্যবেক্ষণ করতে হয়। যেমন একটি শিশু কতমাস বয়সে হাঁটা শিখলো সেটা তুমি পাঠ্যবই পড়লেও জানতে পারবে কিন্তু নিজের পরিচিত কোনো শিশুকে প্রথমবার হাঁটতে দেখলে তোমার সেই সম্পর্কে

ধারণাটা আরও স্পষ্ট হবে। এমনকি ডাক্তারের মতো আন্দাজও করতে পারবে কার কিরূপ মনোবৈজ্ঞানিক সমস্যা আছে। যেমন ধরুন আপনার পরিবারেরই কোনো ছোটো শিশু খুবই দুরন্ত, বয়স বাড়তেই থাকে কিন্তু সে ছোটোবেলায় যেরকম আপনার ঘাড়ে উঠে উৎপাত করতো বারো বছর পরেও দেখলেন সে একটি মুহূর্তেও স্থির নেই। তার বাবা মায়ের মতে সে ছোটো তাই এখনও দুষ্টুমি করে, কিন্তু আপনি দীর্ঘ সময় ধরে পর্যবেক্ষণ করে খুঁজে পেলেন ADHD রোগের লক্ষণগুলি এবং সে ব্যাপারে জানালেন তার অভিভাবকদের, যাতে সেই বাচ্চাটি পরে স্বাভাবিক ও সুস্থ জীবনযাপনের দিকে যেনো তাঁরা দৃষ্টিপাত করে।

Human development পড়লে বিকাশ সংক্রান্ত যেকোনো সমস্যার কথা জানা যায় এবং তার প্রভাব ও প্রতিকারের বিষয়েও জানা যায়। পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি, সাক্ষাৎকার পদ্ধতির মতও গবেষণার বিভিন্ন পদ্ধতিও আমরা শিখতে পারি।

Subject টার তোহ নামই প্রথমবার শুনলাম! তুই কি আগে জানতিস এটার ব্যাপারে?”

জানতাম তো আমিও না। করোনা মহামারির সময় যখন মুড়িমুড়কির মতো নম্বর নিয়ে, কি নিয়ে, কোন কলেজে পড়বো ভেবে দিশেহারা হচ্ছি! ফোনে মেসেজের পর মেসেজ ঢুকছে যে আমি কোথায় চান্স পেয়েছি। তখন আমার কাছে একটা ফোন আসে! ফোনটাই ছিলো ঈশ্বরপ্রদত্ত আমার প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ মহাবিদ্যালয়ের ভর্তি হওয়ার ইঙ্গিত। ফোনে Human development বিভাগের HOD এর সাথে কথা বলে জানতে পারলাম বিষয়টির ব্যাপারে। ব্যাস অন্যরকম টান চলে এলো বিষয়টির প্রতি।

“কলেজে আবার পড়াশোনা হয় নাকি?”

ঠিক এই ধারণা আমিও এককালে পোষণ করতাম। কথায় বলে না, Subject এর প্রতি ভালোবাসা থাকলেও Department এর প্রতি ভালোবাসা থাকে না। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে বিষয় এবং বিভাগ দুটিই খুব কাছের খুব প্রিয়। মাতৃসম দুজন অধ্যাপিকা যেভাবে শাসন এবং ভালোবাসা দিয়ে বিষয়টি বোঝান যে বই ঠুসে পড়ার চেয়ে তাঁদের মুখে সমস্তটা শুনলে সেটি বেশী আত্মস্থ হয়। আমাদের বিভাগের আরও দুইজন স্যার ম্যামও আমাদের বন্ধুর মতন। কোনো কিছুতে সাহায্য লাগলে আগে ছুটে আসেন এবং আমরা সবসময় হাসিখুশি থাকি তাঁদের সাথে। কলেজের বাকি স্যার ম্যামও আমাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করেন। শুধু শিক্ষার পরিবেশও নির্ভর করে না, আমি কপাল করে কয়েকজন সহপাঠী পেয়েছি যারা আমার পরিবারের মতন হয়ে গেছে। আশা করি পরবর্তীকালেও আমরা এরকমই থাকবো।

সবমিলিয়েই আমার কলেজ জীবনের অধ্যায় এলোমেলো কিন্তু রঙীনভাবে চলছে। ধন্যবাদ নবনীতা ম্যাম, গার্গী ম্যাম, অসীমা ম্যাম, সৌম্যজিৎ স্যার আমাদের সবার খেয়াল রাখার জন্য। এবং অবশ্যই সৃজা, শ্রেয়া, অনির্বাণ, মণীষা তোদের ও ধন্যবাদ আমার প্রতিদিনের কলেজ যাওয়ার কারণ হওয়ার জন্য।

বিকাশ যেমন সদা চলমান আমিও জানি না আমার জীবনের এই অধ্যায় কোন পৃষ্ঠায় গিয়ে থামবে...

What if you lived on Mars for a day ?

Sabarna Jana
(5th Semester, Hons, Roll-643 Food and Nutrition Department)

What if you lived on Mars for a day? It would be a very different experience then living on Earth. For one, the planet is much colder than Earth. The atmosphere is also much thinner, which would make it difficult to breathe. There is also very little water on Mars, so you would have to be careful not to use too much.

What if you lived on Mars for a day?

You would need to get used to some significant differences in the environment. For starters, Mars has only 38% of the Earth's gravity, so you would feel lighter and more buoyant than usual. The atmosphere on Mars is also much thinner than Earth's, so you would need to be careful not to overexert yourself and possibly cause injury.The average temperature on Mars are also much colder than Earth, so you would need to dress appropriately and since there are no oceans of water on Mars, you would need to be sure to drink plenty of fluids to stay hydrated. Finally, since Mars has a much longer days than Earth (24 hours and 37 minutes), you would need to be sure to get plenty of rest to avoid getting too tired.

Overall, living on Mars for just one day would be a very different experience than living on Earth. But it would also be a very exciting and interesting experience, and one that you would likely never forget.

The Solar System:

There are many things to consider. The first thing would be the planet's atmosphere. Mars has a very thin atmosphere that is mostly carbon dioxide. This would mean that you would need to wear a space suit or have some other form of protection from the environment. Additionally, the planet is much colder than Earth, so you would need to be prepared for the cold temperatures. The gravity on Mars is also only about 38% of that on Earth, so you would need to adjust to the lower gravity. Finally, Mars has a very dusty and rocky surface, so you would need to be careful not to damage your suit or equipment.

Life on Mars:

Mars has a very hostile environment and is not suitable for human life. There are no oceans of water, no atmosphere and no protection from the harmful radiation of the sun.You would need to wear a space suit with a self-contained oxygen supply at all times. You would also need to have food and water with you, as there is no food or water on Mars.

Mars is a very dangerous place and you could easily die if you're not careful. There are no hospitals or rescue teams on Mars, so if you were to get injured or sick, there would be no one to help you.

You would be the only human on the entire planet! You would have the opportunity to explore the Martian surface and see things that no one has ever seen before. It would be a truly once in a lifetime experience.

The Future of Mars:

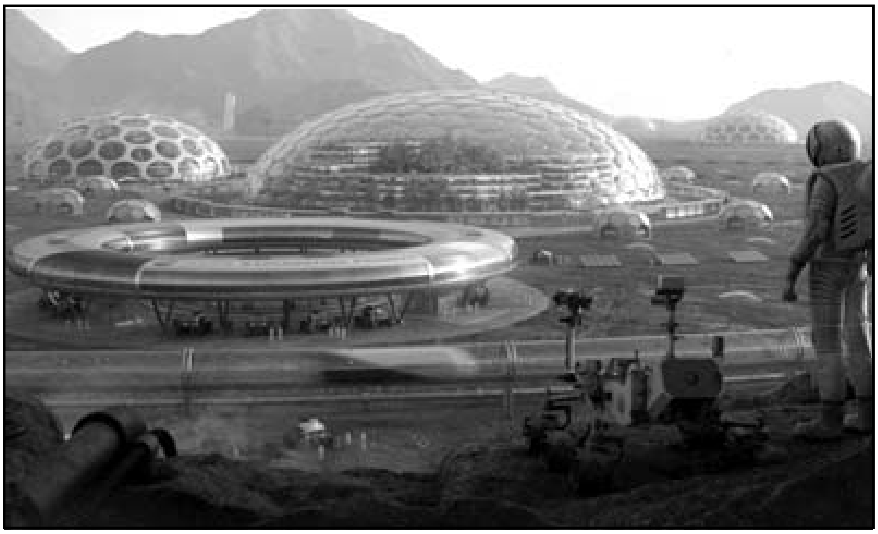

The future of Mars is an exciting prospect. With recent discoveries of water on the planet, there is potential for human habitation in the future. While there are many unknowns about Mars, such as the exact conditions on the surface, there is much to be optimistic about.If you were to live on Mars for a day, you would need to be prepared for some drastic changes. The first would be the lack of air.The atmosphere of Mars is the layer of gases surrounding Mars. It is primarily composed of carbon dioxide 95, molecular nitrogen 2.8, and argon 2.3 It also contains trace levels of water vapor, oxygen, carbon monoxide, hydrogen, and noble gases 352. The atmosphere of Mars is much thinner than Earths. The average surface pressure is only about 610 pascals 0.088 psi which is less than 1 of the Earths value 2. The currently thin Martian atmosphere prohibits the existence of liquid water on the surface of Mars, but many studies suggest that the Martian atmosphere was much thicker in the past.This could take some time to get used to! The final change would be the temperature. Mars is a very cold planet, with an average temperature of -60 degrees Celsius. You would need to wear appropriate clothing and have a warm shelter to protect you from the cold.

You would get to see the planet in a whole new way and learn more about the potential for human habitation on Mars in the future.

Elon Musk plans to build a self-sustaining city on Mars. Ready to live on Mars? It may not happen for a while, as Elon Musk recently revealed that astronauts on the red planet could finally become reality by 2029. The SpaceX CEO has a long-standing vision of establishing a city on the Red Planet.

Conclusion:

It would be very interesting to live on Mars for a day. The planet has a lot of potential and it would be great to see what it is like to live there. There are many things to consider, such as the environment, the food, and the people. It would be a great experience to live on Mars for a day.

UNKNOWN SIGNAL

Sabarna Jana

(Roll Number - 643, Semester- 5, Food & Nutrition)

Captain Rachel Thompson stood at the helm of the USS Discovery, staring out at the vast expanse of space before her. The ship had been on a mission to explore the outer reaches of the galaxy for the past three years, and they had finally reached the edge of known space.

“Captain, we’re picking up an unknown signal coming from the planet ahead,” said the chief communications officer, Lieutenant Samantha Jones.

Rachel turned to the lieutenant and raised an eyebrow. “An unknown signal? That’s not something we encounter every day.”

“No, it’s not,” agreed Samantha. “It’s not like any other signal we’ve ever encountered. It’s almost like it’s not from this universe.”

Rachel’s interest was piqued. “Do we have any idea what it’s saying?”

“No, it’s too garbled. But it’s definitely intelligent. And it’s getting stronger by the second.”

Rachel turned to the navigator. “Set a course for the planet. I want to get a closer look.”

The navigator, Ensign Mark Johnson, nodded and entered the coordinates into the ship’s computer. The USS Discovery changed course, heading towards the mysterious planet.

As they approached, the signal became even stronger. It was unlike anything they had ever encountered before. Rachel could feel the excitement building inside her. This was the reason she had joined Starfleet - to explore the unknown and make new discoveries.

As they entered the planet’s atmosphere, the signal became even clearer. It was definitely intelligent and seemed to be trying to communicate with them. Rachel turned to Samantha. “Can you decipher it?”

Samantha frowned. “I’m trying, but it’s still too garbled. It’s like it’s being transmitted through some kind of interference.”

Rachel nodded. “Keep trying. We need to know what it’s saying.”

The USS Discovery landed on the surface of the planet and the crew began to explore. They found an abandoned city, filled with strange, advanced technology that they had never seen before. As they explored further, they stumbled upon a hidden underground facility.

Rachel turned to her team. “This looks like it could be the source of the signal. Let’s see if we can find out what it’s saying.”

They made their way deeper into the facility, following the signal. It led them to a large room filled with strange, alien machinery. In the center of the room, they found a console with a strange, glowing crystal on it.

Rachel approached the console and tentatively touched the crystal. Suddenly, the signal became crystal clear and a voice filled the room.

"Greetings, human explorers. I am the last survivor of the Qetesh, a highly advanced alien race. My planet was destroyed by a rogue black hole and I was the only one who managed to escape. I have been stranded on this planet for centuries, trying to find a way to contact other intelligent life and ask for their help."

Rachel couldn't believe what she was hearing. They had made contact with an alien race! This was a momentous occasion, one that would change the course of history.

"We will help you," Rachel said, without hesitation. "We have the technology and the resources to get you off this planet and find a new home for you."

The Qetesh's voice was filled with gratitude. "Thank you, human explorers. You have no idea how long I have waited for this moment. Together, we will find a way to save my people."

As the crew of the USS Discovery worked with the Qetesh to find a way to save their race.

উত্তর আধুনিক যুগ, ভারতের জনস্বাস্থ্য এবং ‘আমরা’

স্বাগতিকা সেন

(পুষ্টি ও বিজ্ঞান বিভাগ, ক্লাস-পঞ্চম বর্ষ, রোল-৬৫৩)

বর্তমানে আমি, (অর্থাৎ নিম্নে ‘প্রবন্ধ’ আকারের যা কিছু একটা হাজির করেছে যে) পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত প্রশান্তচন্দ্র মহালনবিশ মহাবিদ্যালয়ের ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন ডিপার্টমেন্টের থার্ড ইয়ারের (নতুন সিবিসিএস নিয়মানুসারে পঞ্চম সেমিস্টার) ছাত্রী। সিলেবাসের পড়াশোনা করতে গিয়েই উপরোক্ত বিষয়টির ওপর আমার বেশ আগ্রহ জন্মায়। সেই আগ্রহ এবং বিষয়টি সম্পর্কে খুঁটিনাটি জ্ঞান আহরণের যে রাসায়নিক সমীকরণ, তাতে অনুঘটকের কাজ করেছে আমার সমবয়সী ছাত্রদের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে আমার যুক্ত থাকা, একথা বলাই বাহুল্য।

অ-পরিপক্ক কলমের ঘষাঘষি, ইচ্ছাকৃত শব্দসংখ্যার বৃদ্ধি করতে না চাওয়ার দরুণ কিছু তথ্যের ঘাটতি এবং খামতিকে সাথে নিয়ে এই লেখা এবং যৎসামান্য জ্ঞানের দরুন অবশ্যই ভুল ও ভ্রান্তি, এই দুটোই বিদ্যমান। নিম্নের এই লেখাটি পড়া শুরু করে দেওয়ার পর, মাঝরাস্তাতে এই সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্ন যাতে মনের মধ্যে না জ্বলে ওঠে, তাই উপরোক্ত এই জবাবদিহি।

“ও জীবন রে, জীবন ছাড়িয়া যাসনে মোরে
তুই জীবন ছাড়িয়া গেলে, মাইনষে কইবো মরা জীবন রে।”

এখন প্রশ্নের উদ্রেক হতেই হয়, জীবনকে আমরা কতটা আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখতে পেরেছি, আর কতটাই বা, বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরোতে তা পরিণত হয়েছে। জীবন কতটা আমাদের সাথে বেঁচে আছে, আর আমরা কতটা জীবনের সাথে সাথে মরে গেছি। “হিং টিং ছট প্রশ্ন এসব, মাথার মধ্যে কামড়ায়।”

একটু চোখ বন্ধ করি, এবং তারপর আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক জীবন যাপন করার খুঁটিনাটি ঘটনা গুলোর ছবি মনের মধ্যে ভাসিয়ে তুলতে চেষ্টা করি। এক রাত থেকে পরের রাতে যাচ্ছি, অনেকটা এইরকম সাইক্লিক মেথডকে মেইনটেইন করতে করতে শুরু করি। অ্যালার্ম ক্লক প্রায় বিলুপ্তির পথে। মুঠোফোন আর অ্যালার্ম ক্লকের বেঁচে থাকার লড়াইতে ‘সারভাইভাল অফ দ্য ফিটেস্ট’ আখ্যা পেয়ে গেছে অবশ্যই মুঠোফোন। ৮.৩০ সময় জানান দিয়ে, ঘুম থেকে তুলে দিয়েই ফেসবুক পোস্টের রিঅ্যাক্ট গোনা অথবা গতরাতে নেটের চ্যাটটা খুলেই ঘুমিয়ে পড়ার অপরাধে তাকে ‘সরি’র বন্যা পাঠানোতে মজিয়ে দিচ্ছে সে (মুঠোফোন অসুবিধা হলে, ‘মোবাইল’ পড়ে নিন)। এইভাবে সূচনা ঘটার পর, না সকালের চা বিস্কুট, না ব্রেকফাস্ট। সোজা লাঞ্চের দৌড়ের পর ছুটতে ছুটতে, ট্রেন বাস মিস করে যাওয়ার ভয়, কলেজের ফার্স্ট ক্লাসের অ্যাটেনডেন্স মিস করে যাওয়ার ভয় অথবা আগের দিন পুরো ব্যালেন্সশীট কমপ্লিট না করে আসায়, বসের মুখঝামটা শুনতে হবে ভেবে একরাশ জমাট চাপ বুকের মধ্যে নিয়ে আমি, আপনি, আমরা ছুটছি। ‘শুধু ছুটে ছুটে চলা।’ আইটি সেক্টরের প্রচন্ড কাজের প্রেশারের মাঝে একটু হালকা হলেই, নীচে এসে রিফ্রেশমেন্টের জন্য “দো ঘুট মুঝে ভি পিলা দে সারাবি, দেখ ফির হোতা হ্যায় কেয়া” বা হয়তো কলেজের অ্যাসাইনমেন্ট শেষ করতে না পারা, ‘সাপ্লি বাঁচাতে রাত

জেগে পড়া'র গতে বাধা জীবন, প্রেমিকার ইনসিকিওরিটির ভীড়ে, প্রায়শই 'ওল্ড মঙ্ক', 'অফিসারস চয়েজ', 'রয়্যাল স্ট্যাগ'-র উল্লাস। সাথে তো রয়েইছে, এই বিগত পাঁচ দশ বছরের মধ্যে জেগে ওঠা নতুন শব্দ, 'ট্রিট'। বন্ধুর দাদু মারা যাওয়া থেকে শুরু করে, বেড়ালের বিয়ে... সবকিছুতেই এখন ট্রিট। সে আমার সাধ্যে কুলালে তো দ্বিতীয় কোনো প্রশ্নই ওঠেনা। আর সামর্থ্য না থাকলেও, ''অমুক মাঝেমাঝেই বউ, গার্লফ্রেন্ড নিয়ে 'পিটার ক্যাট', 'মার্কো পোলো', 'দ্য ব্রিজ' এ খেতে যায়, আমাকেও যেতে হবে, ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিতে হবে, 'ফিলিং ক্রেজি উইথ সামওয়ান অ্যান্ড সিক্সটি নাইন আদার্স', ডিপি পাল্টাতে হবে। নাহলে লোকসমাজে আমার স্ট্যাটাস আর ধূলো; পুরোপুরি এক হয়ে যাবে''র মতো চিন্তা এবং ভাবনাকে সাথে নিয়েও আমরা জোরজবরদস্তি উক্ত কাজগুলো পেরে উঠি। তারপর ঐ 'হে ক্ষণিকের অতিথি' হয়ে রাতবিরেতে বাড়ি ফিরে, আবার মুঠোফোনে মুখ গোঁজা। না বাড়িতে কারোর সাথে মনপ্রাণ খুলে গল্প করা, না রাস্তায় বেরিয়ে পাড়ার বন্ধুদের সাথে খানিকক্ষণের গুজব। 'পাশাপাশি বসে একসাথে দেখা, একসাথে নয় আসলে যে একা। তোমার আমার ভাড়াটের নয়া ফন্দি।' এ তো কবেই 'পুরোনো মহীনের গানে' পাওয়া গেছে। আর আত্মীয় স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী এসব তো এখন অতীত। পাঁচতলা মল, পুরোটাই এখন শুধু 'আমি'। শুধু, 'নিজের জন্যে বাঁচা, নিজেকে নিয়ে।' আত্মীয় স্বজন কেবলই 'আমার, আপনার রেজাল্ট জানতে প্রবল আগ্রহে ফোন করে'— এরকম একটা মনগড়া কথা তো 'ফেসবুক', 'মিম' মনের মধ্যে পেরেক, হাতুড়ি দিয়ে গেঁথে দিয়েইছে। তা, এই গেলো গিয়ে মোটামুটি আজ-কাল-পরশু বা আগামী আরো অনেক ভবিষ্যৎ শতাব্দীর জীবনচর্যার ধারা-উপধারা। এবার আস্তে আস্তে চোখ খুলি। তারপর কাটাছেঁড়া করি, এই সবটাকে নিয়ে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী, Top 4 Lifestyle Diseases in India — CVD, Diabetes Mellitus, COPD, Cancer। তবে, এখানেই শেষ নয়। এরা আরকি একটু বেশিই এগিয়ে গেছে। বাকি যারা আছে, অর্থাৎ Asthma, Peptic Ulcer, Gastro Oesophagul Reflux Diseases, Nephritis, Stress, Depression...এরা আরেকটু জোরকদমে খাটলে, এরাও এগিয়ে যাবে। ১৮৬১ র দিকে, কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র সমকালে, 'নব্যবাবু কালচার' শব্দটি বেশ জনপ্রিয়তা পায়। পরবর্তীতে, মেঘনাদ গুপ্ত (আসল নাম হেমেন্দ্রকুমার রায়। পরে জানা যায় এও তাঁর ছদ্মনাম। একদম আসল নাম, 'প্রসাদ রায়'।) রচিত 'রাতের কলকাতা'র, ''ফিরিঙ্গীদের নকল করে, যেমন অনেক নব্য বাবু চুলোয় গিয়েছেন'' লাইনটার কথা এই অংশে না তুলে এনে পারলাম না। কারণ আমাদের ভারতবর্ষে জাতি গঠনের সময়, অর্থাৎ 'Neheruvian Socialism' এর সময়ে যে শস্য শ্যামলা ভারতবর্ষের মূল জীবিকা ছিল কৃষিকাজ, আস্তে আস্তে সেই চিত্র পাল্টাতে শুরু করলো। ৯০-এর দশক অর্থাৎ গ্যাট চুক্তির পরবর্তীতে বিদেশের বাজার থেকে ভারতের বাজারে টাকা ঢোকার মতো, অর্থনীতিতে নয়া উদারনীতিবাদের ঘটনা ঘটতে শুরু হলো। আর চলচ্চিত্রের মাধ্যমে সেগুলো আমাদের মনের মধ্যে ধীরে ধীরে ঢুকে যেতে যেতেই শুরু হলো পশ্চিমী দুনিয়াকে গিলতে শুরু করা। তার চেয়েও বলা ভালো, গেলার চেষ্টা করতে করতে, না সম্পূর্ণভাবে অ্যাডপ্ট করা গেছে সেই সভ্যতাটাকে, না বাঁচিয়ে রাখা গেছে নিজেদের রীতিনীতিকে। And here, the concept has totally changed। Rural India থেকে আস্তে আস্তে পরিণতি ঘটল Urban Indiaর। হঠাৎ উদ্ভব হলো, 'Urban Middle Class' এর। কিন্তু, তাও খাপছাড়া।

দেশের 'অধিকাংশ' বলা ভুল, গুটিকয়েক মানুষ ছাড়া সবাই তো প্রায় সাধারণ গোষ্ঠীর। আবার, দেখতে গেলে, আশ্চর্যজনক ভাবে এও সত্যি, বিলিনিয়রের দিক থেকেও ভারতবর্ষ যেমন 'সর্বাধিক' শিরোপা পাচ্ছে, বিপিএল এর দিক থেকেও কিন্তু তাই। এই তত্ত্বের তাজা উদাহরণস্বরূপ মুম্বাই এর কথা মনে আনা যেতেই পারে। মোদ্দা কথা, পুরোটাই হয়ে আছে জগাখিচুড়ি অবস্থায়। তো এমতাবস্থায়, 'ভারততীর্থে' 'Communicable disease' এবং 'Non-Communicable disease' এক দেহে হল লীন। এবার সেগুলো কি, কেন, এগুলোর কি অর্থ, সেগুলো একটু নাড়াচাড়া করে দেখি।

১৯৪৭ এর পরবর্তী সময়। সবে সবে তখন, দেশ থেকে ইংরেজরা বিদায় হয়েছে। সদ্য শুরু হয়েছে Nation Building। ঋত্বিক ঘটকরা মেনে নিতে না পারলেও, "এপার বাংলা থেকে ওপার বাংলা আর যাতায়াত আজ পরাধীন"। কাতারে কাতারে মানুষ ঘরছাড়া, ভিটেমাটি ছাড়া, বাস্তুহারা। সোজা ভাষায়, না আছে পর্যাপ্ত খাবার, না আছে মাথাটুকু গোঁজার আশ্রয়। ভাতের ফ্যান খেয়ে জীবনধারন করার মতো বুকফাটা কান্নার কাহিনী পার্টিশন সংক্রান্ত যেকোনো লেখাতেই খুঁজে পাওয়া যাবে। অনাহারে নাহয় মরে যাওয়া যায়। কিন্তু অর্ধাহারে? অপুষ্টিতে? বেঁচে থাকার জন্যেও সেক্ষেত্রে জোরজবরদস্তি। সাথে হানা দিচ্ছে বিভিন্ন রোগ। প্রোটিন ক্যালোরি জনিত অপুষ্টি—কোয়াশিওরকার, ম্যারাসমাস। এখনো শহরের বাইরে গিয়ে, ভারতবর্ষের আসল চিত্র গ্রামগঞ্জে ঘুরলে, এর প্রাদুর্ভাব চোখে পড়তে বাধ্য। ঘিঞ্জি জনবসতি, আধপেট খাওয়া। 'Hygiene' শব্দটা বোধহয় ভারতীয় অভিধানগুলোতে স্থান পায়নি তখনো। অবশ্য স্থান পেলেও, তা দেখার সময় কোথায়! Communicable disease আলোচনা করতে গেলে, আরো কয়েকটা পরিসংখ্যানের তথ্য না তুলে আনলে সমস্যা। ঐযে, আগেই বললাম, ভারতবর্ষের খাপছাড়া অবস্থার কথা। ভেতরটা পুরো ফাঁপা, আর ওপর দিয়ে রঙ চঙ মাখিয়ে উপস্থাপিত করে অর্থনীতির বাজারে ছেড়ে দেওয়ার পর পঞ্চম পুরস্কার জিতে এসেছে আমাদের এই 'ভারততীর্থ'। একটু এবার উঁকি মারি, ঐ ফাঁপা অংশ টায়। যার এক নম্বরে, 'ক্রমবর্ধমান বেকারি'। তাতে কি দেখা যাচ্ছে? ২০২১ এর শুধু নভেম্বর মাসে ৬৮ লক্ষ বেতনভোগী মানুষ কাজ হারিয়েছেন। শহরাঞ্চলে ৯কোটি ভারতবাসী বেকার। শহরে থাকা ২৩% যুবক যুবতীর চাকরি নেই। ২০২১ এর 'বিশ্ব ক্ষুধা সূচক' এর রিপোর্ট অনুযায়ী ১১৬ টা দেশের মধ্যে ভারত ১০১ এ। আমাদের 'Naya India', 'Digital India' পরিচিতি পাচ্ছে 'চরম ক্ষুধা পীড়িত দেশ' হিসেবে। নীতি আয়োগের 'বহুমুখী দারিদ্র সূচক' দেখাচ্ছে, বিহার, ঝাড়খণ্ড, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশে যথাক্রমে ৫১.৯১%, ৪২.১৬%, ৩৭.৭৯%, ৩৬.৬৫% মানুষই দরিদ্র। ক্লাস টু, থ্রি তে আমরা সবাই ভূগোল বইতে কি পড়েছিলাম! ভারতবর্ষের মানুষের প্রধান জীবিকা কৃষিকাজ (এখন আমাদের মধ্যে কেউ যদি মনে করি, "কোথায়! যেদিকে তাকাই, কটা লোক আর চাষবাস করে?" তা ভাবলে কিন্তু ভীষণ রকমের ভুল। আমরা যারা এমনটা ভাববো, তারা তাহলে প্রকৃত ভারতবর্ষের রূপ সম্পর্কে অবগত নই)। তা, যে দেশের জনগণের প্রধান জীবিকা কৃষিকাজ, বিগত দিনে, সেই দেশের কৃষকদের; চাল, ডাল, তেল, নুন, আলু, পিঁয়াজ ইত্যাদি দ্রব্যকে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য তালিকা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা এও প্রত্যক্ষ করেছি, শ্রমিকদের অর্জিত ৮ ঘন্টা কাজের অধিকার, নূন্যতম মজুরির থেকে বীমা কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

এবার আসুন, একটা ছোট্ট অঙ্ক কষি।

একজন সুস্থ, স্বাভাবিক, প্রাপ্তবয়স্ক মহিলার ক্যালোরি চাহিদা ১৯০০ কিলোক্যালোরি। তার সাথে আরো যদি ৩০০ যোগ করি, তাহলে, একজন সুস্থ, স্বাভাবিক, প্রাপ্তবয়স্ক, গর্ভবতী মহিলার ক্যালোরি চাহিদা পূরণ হয়। আর প্রোটিনের চাহিদা মোট ৭৮ গ্রাম (বাকি সব পুষ্টিদ্রব্যের (Nutrients) কথা না হয় বাদ দিলাম)। এগুলো কিন্তু সব দৈনিক হিসাব এবং এই সমগ্র চাহিদা পূরণের জন্য একটি পরিবারের মাসিক আয় যদি নূন্যতম ১৮,০০০ টাকা না হয়, তাহলে তো গর্ভবতী মহিলাদের সঠিক পুষ্টি প্রাপ্তি অসম্ভব। আর গর্ভাবস্থায় মায়ের প্লাসেন্টার মাধ্যমেই তো শিশুর কাছে সমস্ত পুষ্টি উপাদানগুলো পৌঁছাবে। এবং, তা না হলে সেএএএই রিকেট, কোয়াশিওরকার, ম্যারাসমাসে আক্রান্ত ভবিষ্যৎ।

আচ্ছা, এখানে আরেকটা প্রশ্ন মনের মধ্যে কচকচ করাটাও খুব স্বাভাবিক। আমরা সরলভাবে সেগুলো ভাবতেই পারি এবং, সেই ‘‘প্রশ্নগুলো সহজ, আর উত্তরও জানা।’’

প্রশ্ন নম্বর ১. ভারত সরকার তো এই ক্যালোরি, প্রোটিন; মোদ্দা কথা পুষ্টিচাহিদা পূরণ করতেই গর্ভবতী মহিলা এবং শিশুদের জন্য ‘‘সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প’’ (খুব সোজা ভাবে নাহয় পড়ে নিন অঙ্গনওয়াড়ি)-এর ব্যবস্থা করেছে।

প্রশ্ন নম্বর ২. এবং আরো একটি ব্যবস্থা নিয়েছে, ‘মিড ডে মিল’।

(এই দুটি প্রকল্পের কথাই জনগণের কাছে কমবেশি জ্ঞাত। তাই এগুলোর কথাই তুলে আনলাম। বাকি আরো কয়েকটা থাকলেও, সেগুলোর নাম জানার সৌভাগ্য টুকুও আমাদের সকলের হয়ে ওঠেনা)।

এবার উত্তরে বলি— আদতে কিন্তু ব্যাপারটা পুরোপুরি এরকম নয়। প্রথম কথা, ‘অঙ্গনওয়াড়ি’ অথবা এই ‘মিড ডে মিল’ কখনোই একজন গর্ভবতী মহিলা অথবা শিশুর সম্পূর্ণ পুষ্টির যোগান দিতে পারেনা। তারা যে কাজটা করে, তার নাম, ‘অনুপূরক পুষ্টি প্রদান’ (Supplementary Nutrition)। ‘অঙ্গনওয়াড়ি’ কেন্দ্রে, শিশু, কিশোরী ও গর্ভবতী মহিলাদের যথাক্রমে ২০০, ৫০০, ৫০০ কিলোক্যালোরি শক্তি এবং ১০, ২০, ২৫ গ্রাম প্রোটিন দেওয়া হয়ে থাকে এবং ‘মিড ডে মিল’ প্রকল্পে ৩০০ কিলোক্যালোরি শক্তি ও ১২ গ্রাম প্রোটিন দেওয়া হয়ে থাকে। তাহলে এই পরিসংখ্যাগুলো যোগ করে পর্যাপ্ত পুষ্টির মাত্রায় কিন্তু পৌঁছানো যাবেনা। সুতরাং, বাকি চাহিদাটুকুর ঘাটতিতে কিন্তু পাল্লা হালকা হয়েই যাচ্ছে। উপরন্তু এই প্রকল্পগুলোতে কেন্দ্রীয় সরকার ৬০% এবং রাজ্য সরকার ৪০% ব্যয় করার হিসেব দেখায়। তবুও উক্ত পরিকল্পনা গুলো সম্পূর্ণরূপে সফল হয় না—

* অনিয়মিত খাদ্য সরবরাহ

* খাদ্য বিতরণের পথে চুরি

* স্বাস্থ্যের বিভিন্ন পরিষেবাগুলির অনুপস্থিতির কারণে।

এবং এইভাবেই, খুব স্বাভাবিক, সংক্রামক ব্যাধি (Communicable disease)গুলোও তাদের প্রভাব বিস্তার চালিয়ে যাচ্ছে। যাদের মধ্যে কয়েকটার কথা আমি এখানে উল্লেখ করছি।

* শ্বসনতন্ত্রের সংক্রমণ (Respiratory Infections) - স্মলপক্স, মাম্পস, ইনফ্লুয়েঞ্জা, যক্ষ্মা, ডিপথেরিয়া।

* অন্ত্রের সংক্রমণ (Intestinal Infections) - পোলিওমাইসেটিস, ভাইরাল হেপাটাইটিস, কলেরা, টাইফয়েড।

* Surface Infections, STD, AIDS প্রভৃতি।

বলে রাখি, এগুলোর সবকটাই সংক্রমণের দ্বারা ঘটে এবং কোনো না কোনো প্যাথোজেন এগুলোর দায়ভার বহন করছে। এবং আসলি বাত, আমাদের ইমিউন সিস্টেম বুস্ট আপ থাকেনা বলেই, আমরা জাদুর ছড়ি দিয়ে এই রোগগুলোকে চিরতরে ভ্যানিশ করে দিতে পারিনি। উক্ত রোগগুলোর কারণ, লক্ষণের অল্পবিস্তর খানিক ফারাক থাকলেও, আপাতদৃষ্টিতে সবার উৎসই কিন্তু এক।

আগেই আলোচনা করা হয়েছে, ভারতবর্ষের স্বাস্থ্যের অবস্থা এখন আদ্যোপান্ত একটি জগাখিচুড়ি অবস্থায় স্থিত। কোভিড কালে, ড. সাত্যকি হালদারের একটি বক্তব্য তুলে ধরতে এমনিই ইচ্ছে হলো। "আসলে এ দেশে গোটা চিকিৎসা ব্যবস্থাই পাতলা সুতোর উপর ঝুলে আছে। একটু নাড়া দিলেই সব ভেঙে যাবে। করোনা সেই নাড়াটা দিয়ে দিয়েছে।" ফিরে আসা যাক আসল আলোচনায়। দেশের মানুষের পরিসংখ্যা, জীবন জীবিকার ভিত্তিতে, শ্রেণীর ভিত্তিতে এই উক্ত রোগগুলোর প্রাদুর্ভাব হওয়ার কথা থাকলেও, ইদানীং কালে ঐ হঠাৎ উদ্ভুত 'Urbanization' বা 'Urban Middle Class' এর দৌলতে বাড়বাড়ন্ত দেখা দিয়েছে, অ-সংক্রামক ব্যাধির। এবার নজর দেওয়া যাক, অ-সংক্রামক ব্যাধির ওপর।

অ-সংক্রামক ব্যাধি বা আধুনিক জীবনচর্যার ব্যাধি। শব্দগুলো অত্যন্ত কানে লাগছে, তাইনা! ঐযে, যুগের পরিবর্তন। সবকিছুই ক্যাচি হতে হবে। ক্যাচি না হলেই, উক্ত বস্তু তার গুরুত্ব হারাবে। তাহলে, সে কথা মাথায় রেখে, এই 'আধুনিক জীবনচর্যার ব্যাধি'টা পরিবর্তন করে নিয়ে আসি, 'Lifestyle Diseases' কে। শুনতেও ভালো লাগবে, বুঝতেও সুবিধে হবে।

"Lifestyle Diseases are diseases, that are caused partly by Unhealthy Behaviours and partly by Other factors"। উল্লিখিত এই Unhealthy behaviour কি এবং তার যাবতীয় বৃত্তান্ত, লেখা শুরুর একদম প্রথম ধাপেই গল্প আকারে উপস্থাপনা করে দিয়েছি। তাও একটা ছোট্টো তালিকা এখানে দিয়ে দি। পাঠকদের ক্রস চেক করতে সুবিধা হবে।

১. প্রতিদিনের খাদ্য তালিকা এবং দেহের ওজন (Diet and Body weight)

২. প্রতিদিনের শারীরিক পরিশ্রমের পরিমাণ (Level of Physical activity)

৩. ধূমপান ও মদ্যপান (Smoking and alcohol abuse)

৪. মানসিক চাপ, হতাশা (Stress and other Psychological factors)।

ইচ্ছে হলেই এই অভ্যাস ('সু' না 'কু', তা বিচারের দায়িত্ব এখন পাঠকের) আমরা পাল্টাতেই পারি, তাই এগুলো Behavioural Modifiable Risk Factors।

তবে সবসময় যে উপরোক্ত কারণগুলোকেই আমরা দায়ী করবো, এমনটাও নয়। বয়স (Age), বংশপরম্পরা (Heredity) ইত্যাদি অনেককিছুই, চেষ্টা করলেও যা আমরা পাল্টাতে পারবোনা (Non-Modifiable Risk factors), সেগুলোরও দায় বর্তায়। একটা পরিসংখ্যান তুলে ধরলে, বিষয়টা আরো পরিস্কার হবে।

* Major Diseases causing Death

1900 - Pneumonia Diarrhoea Diphtheria

2004 - Diabetes Cancer Alzheimers

পরিসংখ্যানটা ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এবং বোঝা যাবে, এই ১০০ বছরের মধ্যে ভারতবর্ষে, জনগণের মৃত্যুর কারণ পুরোপুরি পাল্টে গেছে। ভিত্তি ঐ, Communicable and Non Communicable Disease।

এবার, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কয়েকটা পরিসংখ্যান একঝলকে দেখে নেওয়া যাক—

* নিম্ন এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত দেশগুলোতেই এরকম খাপছাড়া অবস্থা। এই দু ধরনের রোগ নিয়েই তারা হিমশিম খাচ্ছে।

* ভারতের ৬১.৩ মিলিয়ন লোক এই মুহূর্তে ডায়াবেটিস আক্রান্ত।

* ২,৫০,০০০ জন ভারতীয়, ক্যান্সারের শিকার।

* মাত্র এক তৃতীয়াংশ ভারতীয়র রক্তে ট্রাইগ্লিসেরাইডের (সুবিধার্থে, পড়ি Good Cholesterol, যে হার্টের সমস্যা সৃষ্টি করেনা) পরিমাণ বেশি।

* প্রতি ১০ জন ভারতীয়র মধ্যে ১ জনের মৃত্যুর কারণ Heart attack।

একটা উদাহরণস্বরূপ প্রথমেই যদি মেদাধিক্য (Obesity)র কথা মাথায় আনি, তাহলেই শ'য়ে শ'য়ে পুরোটা মিলিয়ে দেওয়া যাবে। কোনো একজন Obese patient এর, যা যা Complications আসবে, তার মধ্যেই নিঃশব্দে ঢুকে যাবে, আরো কয়েকটা Lifestyle Disease এর নাম। যেমন- CVD, Hypertension, Diabetes, Cancer, Gastrointestinal disturbance এর মতো বিভিন্ন কড়া কড়া রোগ। সাথে তো জুড়ে যাবেই কিছু Psychological disturbances। সুতরাং, বোঝাই যাচ্ছে, 'Obesity is silent killer'। এতক্ষণে এই Lifestyle diseaseগুলো চেনা চেনা ঠেকছে এবং সবারই একটু একটু মাথায় চিন্তা হতে শুরু করেছে, বাধিয়ে তো ফেলেইছি এগুলো। সুস্থ হওয়ার রাস্তা কোথায়?

আচ্ছা, এত্তো চাপ না খেয়ে, একটু ছোট্টবেলায় ফিরে যাই। রিল্যাক্স করতে করতে মনে করি, প্রাইমারির ক্লাসগুলোতে তো সব্বাই ইংলিশে অল্পবিস্তর মুখস্থ করেছি, 'Prevention is better than cure'। কিন্তু সেটা আর মনে রাখা হয়ে ওঠেনি। আর কি করা যাবে! অগত্যা অলিগলি, পাকস্থলীতে ঢুকে গেছিই যখন, বেরোনোর রাস্তাও তো খুঁজে পেতে হবে। সকলের সুবিধার্থে, সেই রাস্তা খুঁজে পাওয়ার কিছু টোটকা এখানে দিয়ে দিই তাহলে—

* সুষম খাদ্যতালিকা মেনে চলতে হবে। (Maintain Balance diet)

* শারীরিক পরিশ্রম করতে হবে, পরিশ্রমের পরিমাণ বাড়াতে হবে।

* সব চিন্তা, ভাবনা; পরের দিনের ব্যালেন্স শীট কমপ্লিট করার চাপ, 'সিজিপিএ এর লোভে রাতজাগা পড়া'র চাপ কে চুলোয় পাঠিয়ে, রাত্রিটুকু বিন্দাস ঘুমোতে হবে।

* ফেসবুকে ঐ crazyর আপডেট দিতেই হবে শপথ নিয়ে, মাঝেমধ্যেই নামীদামী রেস্টুরেন্টে গিয়ে জিরো ক্যালোরি ফুড, জাঙ্ক ফুড খাওয়ার সু-অভ্যেসটি ত্যাগ করতে হবে।

* হাজার কষ্ট হলেও, সেগুলোকে চেপে রেখে, কাউকে বুঝতে দেবো না। 'এই দেখো, আমি খুব ভালো আছি' ভান করে অনবরত 'ওল্ড মঙ্ক' (Cancer council says, there is no threshold for drinking-even one drink do damage) এর উল্লাসে মেতে না উঠে, গলা ছেড়ে কাঁদতে হবে। মা, বাবাকে সব ক্রাইসিস শেয়ার করতে হবে। প্রিয় বন্ধুকে প্রিয় গান দিয়ে, তাকে জাপ্টে কাঁদতে হবে।

* জীবনকে খুব সাদামাটা ভাবে যাপন করতে হবে। হাইলি অ্যাম্বিশাস হয়ে, স্ট্যাটাস বাড়িয়ে ফেললেই সমস্যা। তারপর এঁটুলির মতো লেগে থাকবে, Anxiety, Depression, Frustration।

এই ছোটো ছোটো কথাগুলো মাথায় গেঁথে ফেলতে হবে। সমাজের মূল স্রোত থেকে বেরিয়ে গিয়ে, সাধ্যের মধ্যে না কুলোলেও, কোনোকিছুকে জোর করে করতেই হবে, এই চিন্তাভাবনাগুলোকে লাথি মেরে ঝেড়ে ফেলে দিতে হবে। আর সমাজ গড়ার যারা মূল কারিগর, যা সমাজের মূল ভিত্তি; শিক্ষক, শিক্ষা এবং শিক্ষার্থী, তাদের ভেতর থেকেই প্রথম এই চিন্তা, চেতনাগুলো বেরিয়ে আসতে হবে। তারাই তো ভাববে, পাশের মানুষকে ভাবতে শেখাবে, ভাবতে প্র্যাকটিস করাবে। কিন্তু হায়! একটা সম্পূর্ণ জেনারেশন, জীবনের শুরুর পথ থেকেই তারা দেখছে, যারা সমাজ তৈরি করে, সমাজের কারিগর যারা, তাঁদের একাংশের ভিত শক্ত নয়। দূর্বলতার লাঠিতে ভর করে তাঁরা, বহুদূর, বহুদূর হেঁটে এসেছে। একটা সম্পূর্ণ জেনারেশন, বেমালুম ভুলতে বসেছে তাদের জীবনের অপরিহার্য, মৌলিক চাহিদা গুলো। তারা ভুলে গেছে মন থেকে, ‘‘Koi To Dilbar Ho Yaar, Jisko Tujhse Ho Pyaar, Koi To Dilbar Ho Yaar” গাইতে। জীবনের প্রথম দিন থেকে তাদের শেখানো হয়েছে, ‘কেউ বন্ধু নয়, সবাই তোমার কম্পিটিটর।’ তাদের চিন্তাভাবনাটা সম্পূর্ণ এলোমেলো করে দেওয়া হচ্ছে। নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি (২০২০), শিশুর প্রাথমিক স্তরে যত্ন নেওয়ার বৈজ্ঞানিক ধারণা এবং ৬ বছরের নীচের শিশুদের শিক্ষাদান প্রক্রিয়াকে ভুলিয়ে দিচ্ছে। ফলত, প্রাথমিক শিক্ষা থেকেই, শিক্ষার মূল নীতি, ‘চিন্তা’, ‘চেতনা’, ‘মুক্তি’র দ্বারা প্রকৃত শিক্ষা না হয়ে, কোনো কিছুকে গভীরে গিয়ে ভাবার পরিধির মেরুদন্ডটাই গুঁড়িয়ে যাচ্ছে এবং, যার ফলে, সেই শিশুরাই প্রাপ্তবয়সে বা বলা ভালো, ভাবতে শেখার বয়সে পৌঁছে বুঝতে পারছেনা, তার নিজের দেশকে চিনতে, জানতে, উপলব্ধি করতে ভুলে যাচ্ছে। দেশের ভবিষ্যৎ পরিস্থিতির কথা ভাবতে গেলে, তাদের ‘ল্যাদ’ লাগছে, বিরক্ত লাগছে, বোরিং লাগছে। নদীর স্রোতের মতো তারা ‘চলেছে ঢেউয়ে ঢেউয়ে কোথায়’ এবং এইভাবেই আবার, আমার শুরুর দিকের কথাগুলোতেই ফিরে যাচ্ছে তারা। তবুও যাঁরা পথ দেখিয়ে গেছিলো, কত যুগ ধরে ধরে, সূর্য রচনা করে গেছিলো, তাঁদের দেখানো পথকে আঁকড়ে ধরে আমাদের ভাবতেই হবে, পাশের জনকে ভাবানোর ভাবনায়, সামিল হতে হবে, দৃপ্ত কণ্ঠে বলে যেতে হবে,

‘প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য,
ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা।
চোখে আর স্বপ্নের নেই নীল মদ্য,
কাঠফাটা রোদ সেঁকে চামড়া।’

২৬শে এপ্রিল

কাহিনী ভট্টাচার্য

(মানব বিকাশ বিভাগ, রোল ৫৪১, ৩য় সেমিস্টার)

রাতে পড়া থেকে ফেরার পথে একটা গলির মুখে কিছু ছন্নছাড়া ছেলের আড্ডা শুনে থেমে গেলাম আমি! তাদের অদ্ভুত চাহনি যেনো আমার সর্বাঙ্গ গ্রাস করে পা দুটোকেও অচল করে দিলো, একটা ভয় আমাকে তাদের সামনে দিয়ে যেতে বাধা দিলো! পাশে একটা সাইকেলের চলার শব্দ পেয়েই ঘুরে তাকাতে দেখি একটি পরিচিত ছায়া মানব ধীরগতিতে আমার পাশ দিয়ে সাইকেল টিকে ধরে চলতে লাগলো। চোখটা জ্বলজ্বল করে উঠলো আমার, তার মানে কি সত্যিই সে আমার সাথেই আছে? তাকে দেখে অভয় পেয়ে আমিও এগোতে থাকি তার ছায়াপথে। ছেলেগুলোর অধীন গন্ডি পেরিয়ে আমি এখন আলো পথে এলাম কিন্তু সেই পরিচিত ছায়ামূর্তিটি যে অন্য কোনো অপরিচিত ব্যাক্তির ছিলো সেটা আমি আলোয় এসে তার মুখ দেখে বুঝলাম। হতাশায় সেই কল্পনার মানুষটিকে আর সাইকেল আরোহণকারী মানুষ দুজনকেই চোখের সামনে মিলিয়ে যেতে দেখলাম। অবশ্য কি মিল তাদের মধ্যে। দুজনের দেহের গঠনই এক। দুজনেই সাইকেল চালায়, দুজনেই এভাবে আমার সাথে চলে আর দুজনেই এভাবে আমাকে বিপদ থেকে রক্ষা করে। চোখের আন্দাজে কেউই তাদের দুজনের মধ্যে তফাৎ খুঁজে পাবে না হয়তো শুধু একটাই তফাৎ সেই আগন্তুক অন্য কারোর বাবা আর সেই কল্পনায় ভাসা মানুষটি আমার বাবা। হতাশা ভরা নয়ন নিয়ে সেই আগন্তুককেই দেখতে লাগলাম যতক্ষণ না সে দৃষ্টিসীমা অতিক্রম করে, যাকে দেখতে চাইছিলাম তাকে দেখতে না পেলেও সেই লোকটির গমন আমাকে বাবার কথাই মনে করে দিতে লাগলো। প্রান ভরে দেখলাম তাকে।

বাড়িতে ঢুকতেই দেখি তাঁর সাইকেল সিঁড়িতে দাঁড় করানো। কত যুগের ধুলোর স্তর পরেছে যেনো তার ওপর, বলে না "স্মৃতি কণা"? ঠিক সেরকমই প্যাডেলের ওপর তার পায়ের ধুলো, হ্যান্ডেলে তাঁর পরিশ্রমের ঘাম সবই রয়েছে তাতে কিন্তু সেই...

অভ্যাসমতো সিঁড়ি দিয়ে উঠেই বারান্দার দিকে ছুটতে ছুটতে "ভাইইইইইইইই... (ঠাম্মা কে 'ভাই' বলে ডাকতাম)" বলে সুর টানতে যাবো এমন সময় তাঁর ঘরে রাখা ছবিটি দেখে থমকে গেলাম। "এ আমি কাকে ডাকছিলাম?" — নিজেকে নিজে প্রশ্ন করতে লাগলাম।

বাষ্প ভরা চোখ নিয়ে ঘরে ঢুকতেই দেখি চেয়ারের ওপর বাবা বসে! সারা দেহে যেনো বিদ্যুৎ প্রবাহ ছুটে গেলো! দ্বিতীয় পলকে মোহভঙ্গ ঘটিয়ে দেখলাম তিনি বাবা না একটি বিরাট আকৃতির ব্যানার যাতে বাবার ছবি আছে।

ছবিটা দেখে আর চোখের জল বাঁধ মানলো না! "বাবা" বলে চিৎকার করে উঠলাম। মা পাশের ঘর থেকে ছুটে এসে দ্যাখে আমি ছবিটা ধরে কাঁদছি। মা আটকালো না! যে মা আমার চোখে জল আসতে দিতো না সেই মা স্থির হয়ে বাপ হারানো মেয়েটার অশ্রুসিক্ত মুখের দিকে চেয়ে রইলো! মা চাইছিলো আমি কাঁদি কারণ সেই ২৬শে এপ্রিল আমি বাবার মৃতদেহ দেখে কাঁদিনি, পাথর হয়ে তাঁর মাথায় হাত

বুলিয়ে দিচ্ছিলাম যদি সে আবার ফিরে তাকায়; তাঁর চলে যাওয়ার আগে একটি মাস ধরে আমি ঠাকুর ঘরে বসে মাথা কুটেছি, বুঝিনি মৃত্যু এতো বিভৎস। পুত্রশোকে আকুল ঠাম্মাও একমাস বাদে দেহ রাখে, যাওয়ার আগে বলে যায় এই ঠাকুর ঘরে যেনো আর পূজো না হয়। আমিও মুখ সরালাম সেই ভাগ্যলক্ষ্মীর থেকে! কোন সুখ চাইবো আমি যদি সেই আমার মুখে হাসি ফোটানোর লোকটিই চলে যায়? আর এখন দ্যাখো আমাকে নাকি আমার বাবার শোকসভায় তাঁর উদ্দেশ্যে দুটি শব্দ বলতে হবে তাঁর জন্যই সেই ব্যানারটা আনা হয়েছে। ভাগ্যের কি কৃপা! আমার বাবা বেঁচে থাকতে যে নখের ধুলোর যোগ্য সম্মানটুকুও পেলো না সেটা এখন পার্টির লোক শোকসভা করে দেখাতে চেয়েছে।

মা আমার এই অবস্থা দেখে তারপর নিজেও ভেঙে পরে কান্নায়। আমি তারপর নিজেকে শান্ত করে মাকে জড়িয়ে ধরলাম, মা নিজেকে ছাড়িয়ে বাবার ছবির দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলো "মেয়েটার কান্না দেখেও তুমি ছবি হয়ে রয়েছো?" আমি নিস্তব্ধ হয়ে গেলাম। সামনে রাখা স্পিচটা হাতে নিয়ে তৈরী হয়ে গেলাম শোকসভার উদ্দেশ্যে!

জনাকীর্ণ লোকের মাঝে আমার ওইটুকু ২৬শে এপ্রিলের বর্ণনা আর বাবার প্রতি আমার ভালোবাসার টান টা কাঁদিয়ে দিলো সবাইকে! বক্তব্য অন্তে সামনে তাকাতেই দেখি শ্রোতাদের মাঝে দুটো চেয়ারে বাবা আর ভাই বসে। তাঁদের চোখে জল মুখে হাসি! হয়তো তাঁরা আমার বাক্যগুলিতে মুগ্ধ হয়েছে, প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করছে যেনো। চোখ বন্ধ করে স্বস্তির শ্বাস ফেলে মনে মনে তাঁদের বলি "যেখানেই থেকো ভালো থেকো আর আমার সাথে থেকো আর সবসময় এভাবে আশীর্বাদ কোরো।"

ভারতের দারিদ্রতার সমস্যা

শ্রেয়া হালদার
(মানব উন্নয়ন বিভাগ, ৩য় সেমিস্টার, রোল-৫৪৫)

সূচনা

ভারতের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশে দারিদ্রতা হল অন্যতম বিপজ্জনক ভারতীয় সমস্যা। গৃহীত পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য হল দারিদ্রতা দূরীকরণ। দরিদ্র অর্থে যে সব ব্যক্তি বেঁচে থাকার জন্য মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয় তাকে দরিদ্র বলে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। নোবেল জয়ী অমর্ত্য সেনের বক্তব্য অনুযায়ী বলা যায় আপেক্ষিক বঞ্চনা দারিদ্র্য সম্পর্কিত ধারণা ব্যাখ্যার একটি সহায়ক উপাদান হতে পারে।

মানুষের বেঁচে থাকার জন্য যে পরিমাণ খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান ইত্যাদি মৌলিক চাহিদাগুলির পূরণের প্রয়োজন হয় তার সংস্থান যারা করতে পারেনা, তাদের দরিদ্র বলা হয়।

দাম সূচক ধরে যে মাথাপিছু আয় ন্যূনতম মাথাপিছু ভোগ ব্যয়ের জন্য প্রয়োজন বলে মনে করা হয় তাকে দারিদ্র্য রেখা বলে। ন্যূনতম আয় রেখার নীচে অবস্থানকারীদের দরিদ্র বলে আখ্যা দেওয়া হয়।

দারিদ্র্যসীমা নির্ধারণের প্রত্যক্ষ পদ্ধতি প্রয়োগে যদি জনসাধারণের দ্বারা ব্যয়িত ভোগ ব্যয় দ্বারা প্রয়োজনীয় মৌলিক চাহিদা পূরণ না হয় তবে দরিদ্র বলা যেতে পারে। আয় পদ্ধতি প্রয়োগে ন্যূনতম চাহিদা নিবারণের জন্য আর্থিক ক্ষমতার অক্ষমতাকে দরিদ্রতা বলা যেতে পারে।

ভারতের পরিকল্পনা কমিশন দ্বারা গঠিত টাক্সফোর্স দ্বারা দারিদ্র্যতার ন্যূনতম মান পরিমাপের প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী গ্রামাঞ্চলে ২৪০০ ক্যালরী যুক্ত খাদ্যশস্য এবং শহরাঞ্চলে ২১০০ ক্যালরিযুক্ত খাদ্যশস্য একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির ন্যূনতম প্রয়োজন বলে মনে করে। এই ন্যূনতম দৈনিক ক্যালরির গ্রহণের ভিত্তিতে মাথাপিছু মাফিক ভোগব্যয়কে দারিদ্র রেখা বলে।

ভারতের দারিদ্রের পরিমাপ (Measurement of Poverty in India) :

বিভিন্ন সংগঠন দ্বারা দারিদ্র ব্যক্তির সংখ্যার তথ্য বিভিন্নরকম হওয়ার ফলে প্রকৃত দরিদ্র্যব্যক্তির সংখ্যার পরিমাপ করা সমীক্ষার ফলাফল অনুসারে পৃথক হয়েছে। সেইজন্য ২২৫০ ক্যালরিযুক্ত খাদ্যশস্যকে ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা ধরে ভারতের দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী জনসংখ্যার শতকরা হিসাব নিচের সারণীতে প্রকাশ করা হল :

	গ্রামাঞ্চলে	শহরাঞ্চলে	মোট
১৯৮৭-৮৮	৩৯%	৩৯.৩%	৩৮%
১৯৯৩-৯৪	৩৭%	৩২%	৩৬%
১৯৯৯-২০০০	২৭%	২৩%	২৩%
২০০০-২০০১	—	—	২৫%

পরিসংখ্যান অনুযায়ী গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চলে দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী জনসংখ্যার শতকরা হার ক্রমাগত ভাবে কমছে। ২০০৪-০৫ সালে Uniform Recall Period এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী ভারতে দারিদ্র সীমার নীচে জনসংখ্যার পরিমাণ ২৮%। এর মধ্যে গ্রামাঞ্চলে ২৮.৩% এবং শহরাঞ্চল ২৫.৭%। একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দারিদ্রের পরিমাণ ১০% কমানোর লক্ষমাত্রা ধার্য্য করা হয়েছে।

ভারতে দারিদ্র্যের কারণ (Causes of Poverty in India) :

ভারতে দারিদ্র্যের প্রধান কারণগুলি হলো:

(১) দ্রুতহারে জনসংখ্যার বৃদ্ধি: দ্রুতহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ভারতে দারিদ্র্যের অন্যতম প্রধান কারণ। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে সম্পদ সৃষ্টির পরিমাণ দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচীতে ব্যয়িত হয় বলে সঞ্চিত মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি হয় না; ফলে উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির পরিমাণ বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব হয় না ফলে দারিদ্রতা ক্রমশ বাড়তে থাকে।

(২) পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ত্রুটি: প্রথম চারটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সামাজিক ন্যায় বিচারকে উপেক্ষা করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতি দায়িত্ব আরোপ করার ফলে দরিদ্রতা আরও ব্যাপক আকার ধারণ করে।

(৩) দারিদ্র্যের চক্র: ভারতের স্বল্প জাতীয় আয়, স্বল্প সঞ্চয়, কম পরিমাণ মূলধন গঠন ইত্যাদি কারণে দারিদ্র্য চক্রাকারে আবর্তিত হয় বলে দারিদ্র্যের প্রকোপ অতিরিক্ত হারে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে পড়ছে।

(৪) মুদ্রাস্ফীতি: ভারতে মুদ্রাস্ফীতির দরুন নিম্ন মাথাপিছু আয়কারীদের আর্থিক অবস্থার অবনতির কারণে তাদের ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা পূরণে অক্ষম হয়ে পড়ে সেইজন্য দারিদ্র্যের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে পড়েছে; সংকটজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে তুলেছে।

(৫) কৃষি উন্নয়নে ঘাটতি: ভারত কৃষি প্রধান দেশ। বিভিন্ন পরিকল্পনায় গৃহীত কর্মসূচীর দ্বারা সামগ্রিক উন্নতি না হওয়ায় গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র ব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছে।

(৬) আয় ও সম্পদের অসম বন্টন: দ্রুতহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে জাতীয় আয়ের পরিমাণ ও মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ উন্নত দেশ অপেক্ষা অনেক কম এবং জাতীয় আয়ের অসম বন্টনের ফলে শ্রেণী বৈষম্য ব্যাপকভাবে বেড়ে চলেছে। দরিদ্র ব্যক্তিদের কাছে উন্নয়নের সুফল না পৌঁছানোর ফলে দারিদ্র্য অবস্থার উন্নতি পরিলক্ষিত হয়নি।

(৭) সম্পদের বহির্গমন: বৈদেশিক ঋণের, বহুজাতিক সংস্থার অবাধ প্রবেশ ইত্যাদির কারণে সম্পদের বেশীরভাগ অংশ রপ্তানী বাণিজ্যে বহিরাগমন ঘটে ফলে আভ্যন্তরীণ সম্পদের ভাণ্ডারে টান পড়ে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক কাজকর্ম ব্যাহত হয়ে পড়ে।

(৮) দারিদ্র বিরোধী কর্মসূচীর অপর্যাপ্ততা: কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা গৃহীত কর্মসূচীর পরিমাণ কম ও যথাযথ রূপদানে ব্যর্থতার কারণে দরিদ্র ব্যক্তির সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে পড়েছে।

দরিদ্র অবস্থার উন্নতির জন্য দরকার দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন প্রকল্পগুলির যথাযথ রূপদান; যার পরিপ্রেক্ষিতে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি ঘটানো সম্ভব হবে।

ভারত সরকারের দারিদ্র দূরীকরণের জন্য গৃহীত ব্যবস্থা:

কার্যত পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা থেকে সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষে দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচী গৃহীত হয়। দরিদ্র জনগণের ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা নিবারণের জন্য নিম্নলিখিত কর্মসূচীগুলি গ্রহণ করা হয়:

(i) সুসংহত গ্রামীন উন্নয়ন কর্মসূচী (IRDP)

(ii) জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান কর্মসূচী (NREP)

(iii) গ্রামীণ ভূমিহীন কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা কর্মসূচী (RLEGP)

(iv) শহরের শিক্ষিত যুবকদের জন্য স্বনিয়োজিত কর্ম সংস্থান প্রকল্প (SEEUY)

(v) শহরের দরিদ্র জনসাধারণের জন্য স্ব নিয়োজিত কর্মসংস্থান কর্মসূচী (SEPUP)

(vi) জওহর রোজগার যোজনা (JRY)

(vii) নেহেরু রোজগার যোজনা (NRY)

(viii) কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্প (EAS)

(ix) প্রধান মন্ত্রী রোজগার যোজনা (PMRY)

(x) গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি কর্মসূচী (REGP)

(xi) স্বর্ণজয়ন্তী শহরী রোজগার যোজনা (SJSRY)

(xii) স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা (SGSY)

(xiii) জওহর গ্রাম সমৃদ্ধি যোজনা (JGSY)

(xiv) জাতীয় কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্প (NFFWP)

(xv) জাতীয় গ্রামীণ কর্ম সংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্প ইত্যাদি।

উপরিউক্ত গৃহীত কর্মসূচীগুলির যথাযথ রূপদানে ব্যর্থতার কারণে দারিদ্রতা সম্পূর্নভাবে হ্রাস করা সম্ভব হয় নি। ভারতের দারিদ্রতা হ্রাসের নিমিত্তে প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন প্রকল্প যার বাস্তবভিত্তিক ও যথাযথ রূপদানে দরিদ্র অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হবে।

সবুজ বিপ্লব

শর্মিষ্ঠা সামন্ত

(পুষ্টি ও বিজ্ঞান বিভাগ, প্রথম সেমিস্টার, রোল-৬৩৮)

ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কৃষিতে অধিক পরিমাণ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। এর ফলে সমবায় কৃষির অগ্রগতি অধিক হয়। কিন্তু দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিল্পের উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়ার ফলে কৃষির উন্নতিতে ঘাটতি দেখা দেয়। এছাড়া বৃষ্টিপাত অনিয়মিত হওয়ায় এবং পরিমাণের চেয়ে কম হওয়ায় কৃষির উৎপাদন আশানুরূপ বৃদ্ধি না পাওয়ায় খাদ্যে ঘাটতি দেখা যায়। এর ফলে খাদ্যের মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং প্রয়োজন হয়ে পড়ে বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানি করতে।

এই ব্যাপক খাদ্যসমস্যা সমাধানের জন্য তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এক নতুন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। ১৯৬০-৬১ সালে প্রথমে ভারতের সাতটি জেলাকে নিবিড় কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে আনা হয়। এই সাতটি জেলাকে পছন্দ করার পিছনে কারণ ছিল যে সেই সব জেলায় জলসেচের সুবিধা থাকা। পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলাকে এই আওতায় নেওয়া হয়। এই প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, সেচবিশিষ্ট অঞ্চলে উন্নতমানের বীজ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক ঔষধ প্রভৃতি ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করা। এই প্রকল্পে যথেষ্ট সাফল্য আসে এবং উৎসাহিত হয়ে এই প্রকল্পকে ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটানো হয়। ১৯৬৬ সালের পর থেকে আরও ব্যাপকভাবে এই ব্যবস্থাকে জোরদার করা হয়। ফলস্বরূপ উৎপাদনও বেশ দ্রুতহারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই নতুন প্রকল্পের পশ্চাতে তিনটি বিষয় স্তম্ভ হিসাবে কাজ করে—(ক) উচ্চ ফলনশীল বীজের ব্যবহার, (খ) ছোট সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ এবং (গ) রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ঔষধের ব্যবহার। এই নতুন পদ্ধতিকে বলা হয় 'নতুন কৃষি কৌশল'। এর ফলে কৃষি উৎপাদন এত দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেয়েছে যে এই পরিবর্তনকে বিপ্লবও আখ্যা দেওয়া হয়। কৃষি তথা উৎপাদন ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন বলে এই ঘটনাকে সবুজ বিপ্লব বলা হয়। নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারে প্রধানত পাঞ্জাবে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। ইতিমধ্যে ভারতে ভূমিস্বত্বেরও পরিবর্তন ঘটে। ফলে এই পরিবর্তনের পাশাপাশি নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার উৎপাদনে প্রভাব বিস্তার করে। উন্নতমানের প্রযুক্তি সাহায্য করে সবুজ বিপ্লব ঘটাতে। এই নতুন প্রযুক্তির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। বৈশিষ্ট্যগুলি হল :

(১) পুরাতন নিম্ন ফলনশীল বীজের পরিবর্তে উচ্চ ফলনশীল বীজের প্রচলন। গবেষণার ফলে জানা গেছে যে উচ্চ ফলনশীল বীজের আভ্যন্তরীণ গুণের ফলে ছোট ছোট গাছেও অধিক ফলন হয়।

(২) উচ্চ ফলনশীল বীজের জন্য রাসায়নিক সারের অধিক প্রয়োগ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই সারগুলির মধ্যে বিশেষভাবে প্রয়োজন নাইট্রোজেন জাতীয় সার ও ফসফরাস সার।

(৩) উচ্চফলনশীল বীজের জন্য অধিক পরিমাণ সেচের প্রয়োজন। অধিক পরিমাণ জলের যোগান ভিন্ন উচ্চ ফলনশীল বীজ থেকে উৎপন্ন গাছে অধিক ফলন আশা করা যায় না।

(৪) উচ্চ ফলনশীল বীজের গাছ খুব দ্রুত বৃদ্ধি পায়। একাধিকবার সার প্রয়োগের ফলে বছরে দু থেকে তিনবারও ফসল তোলা সম্ভব হয়।

(৫) একাধিকবার ফসল উৎপাদন ও অধিক পরিমাণ উৎপাদনের জন্য দরকার হয় কৃষিক্ষেত্রে উন্নতমানের যন্ত্রপাতির ব্যবহার। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ট্রাক্টর, গভীর নলকূপ, ডিপ টিউবওয়েল ও পাম্পসেট প্রভৃতি। তাছাড়া ওষুধ প্রয়োগের জন্য স্প্রে মেসিনও চাই। অনেক সময় বিদ্যুতেরও দরকার হয়।

(৬) উচ্চ ফলনশীল বীজের জন্য বিদেশ থেকে কীটনাশক ঔষধ আমদানি করতে হয়। যে বীজ প্রয়োগ করা হয় তা আমাদের দেশের জলবায়ুর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বলেই কীট-পতঙ্গের প্রভাব অধিক হয় এবং সেইজন্যই ঔষধ চারাগাছ থেকে শুরু করে ফলনের পূর্ব পর্যন্ত ছড়াতে হয়।

(৭) উন্নত ফলনশীল চাষ ব্যয়সাধ্য। কারণ এই নতুন প্রযুক্তিতে বীজ, সার, কীটনাশক ঔষধ, কূপ খনন, পাম্পসেট, স্প্রে মেসিন, জ্বালানি তেল প্রভৃতিতে অত্যন্ত ব্যয় হয়। সেই সঙ্গে চাষীকে ঝুঁকিও নিতে হয়।

নতুন কৃষি কৌশলের বা সবুজ বিপ্লবের ফলাফল:

ভারতের কৃষির ওপর সবুজ বিপ্লবের ফলাফল বহুমুখী। নতুন কৃষি কৌশলের বা সবুজ বিপ্লবের সুফলগুলি নীচে আলোচনা করা হল:

(১) খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি: কৃষিক্ষেত্রে এই নতুন কৌশল প্রয়োগের ফলে খাদ্যশস্যের উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধিই সবুজ বিপ্লবের প্রধান সাফল্য। খাদ্যশস্যের হেক্টর প্রতি উৎপাদন ১৯৬০-৬১ সালে ৭১০ কেজি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৯-২০০০ সালে হয় ১,৬৯৭ কেজি। এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ছিল গমের অভাবনীয় উৎপাদন বৃদ্ধি। ১৯৬০-৬১ সালে হেক্টর প্রতি গমের ফলন ছিল ৮৫১ কেজি এবং ১৯৯৯-২০০০ সালে এই পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে হয় ২,৭৫৫ কেজি। ঐ একই সময়ে ধানের হেক্টর-পিছু উৎপাদন ১,০১৩ কেজি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১,৯৯০ কেজি হয়েছে।

(২) শস্য উৎপাদনের ধরনের পরিবর্তন: কৃষিক্ষেত্রে নতুন কৌশল প্রয়োগের ফলে ভারতে শস্য উৎপাদনের ধরনে পরিবর্তন ঘটেছে। সবুজ বিপ্লবের কারণে দানাশস্যের বার্ষিক উৎপাদন বৃদ্ধির হার ছিল ৩% থেকে ৪%। কিন্তু ঐ একই সময়ে ডাল শস্যের উৎপাদনের কোনরকম বৃদ্ধি হয়নি বরং কিছু কিছু ক্ষেত্রে উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে।

(৩) গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা বৃদ্ধি: সবুজ বিপ্লবের মাধ্যমে সারাবছর ধরে বহুফসলী কৃষিব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার ফলে গ্রামাঞ্চলে সারা বছর ধরে কৃষিশ্রমিকের বিপুল চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেয়েছে।

(৪) সবুজ বিপ্লবের ফলে কৃষিক্ষেত্রে যন্ত্রপাতির ব্যবহার ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সংযুক্তি প্রভাবের (Linkage effect) ফলে ঐসব যন্ত্র উৎপাদনকারী শিল্পগুলির অবস্থা ক্রমশ উন্নত হচ্ছে।

(৫) সবুজ বিপ্লবের ফলে কৃষকেরা বাজারমুখী হয়েছে, তাদের আর্থিক আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে কৃষকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে।

(৬) সবুজ বিপ্লবের ফলে নতুন নতুন এলাকায় যেমন আধুনিক কৃষিপ্রযুক্তির প্রসার ঘটেছে, তেমনই সম্প্রসারিত হয়েছে সেচসেবিত এলাকা। সেচব্যবস্থা সম্প্রসারিত হওয়ায় অনেক অনুর্বর ও অনুৎপাদিত জমি উৎপাদনের আওতায় এসেছে।

(৭) আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার কৃষিতে নতুন সম্ভাবনার দিগন্ত খুলে দিয়েছে। ফলে জীবনধারণের জন্য কৃষি এখন লাভজনক পেশায় পরিণত হয়েছে।

নতুন কৃষি কৌশলের বা সবুজ বিপ্লবের কুফল বা প্রতিকূল প্রভাব :

ভারতে প্রবর্তিত সবুজ বিপ্লবের এত সাফল্য বা অনুকূল প্রভাব থাকা সত্ত্বেও এর কিছু প্রতিকূল প্রভাব বা ব্যর্থতাও বর্তমান। সবুজ বিপ্লবের কুফলগুলি নীচে আলোচনা করা হল :

(১) সমস্ত ফসলের উপর প্রভাব বিস্তার করেনি: সবুজ বিপ্লব সব ফসলের ক্ষেত্রে সমানভাবে কার্যকর হয়নি। গম ও ইক্ষু উৎপাদনের ক্ষেত্রে সবুজ বিপ্লব যতখানি সুদূরপ্রসারী ও সফল হয়েছে ধানের ক্ষেত্রে ততখানি হয়নি। উচ্চফলনশীল ধানের বীজ ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা সত্ত্বেও সেচব্যবস্থা আশানুরূপভাবে সম্প্রসারিত না হওয়ার দরুন নতুন কৃষি কৌশল ধানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সফল হয়নি। কার্য্যত গমের ক্ষেত্রেই উৎপাদনের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটে। ভাই সবুজ বিপ্লব না বলে একে "গম বিপ্লব" বলাই যুক্তিসঙ্গত।

(২) আঞ্চলিক বৈষম্য বৃদ্ধি: সবুজ বিপ্লব ভারতের সব রাজ্যে সর্বত্র সমান প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। দেশের সর্বত্র সবুজ বিপ্লব পরিব্যাপ্ত না হওয়ার মূলে আছে প্রধানত কৃষি উপকরণগুলির লভ্যতার তারতম্য। নতুন কৃষি কৌশলে উচ্চফলনশীল বীজ, সার, কীটনাশক ও সেচের উপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়। ভারতের যেসব অঞ্চলে সেচের নিশ্চিত সুবিধা ছিল সেইসব অঞ্চলেই উচ্চফলনশীল বীজের সার্থক ব্যবহার সম্ভব হয়েছ। ফলে পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমাঞ্চল, বিহার, তামিলনাড়ু এই নতুন কৃষি কৌশল প্রয়োগের ফলে বিশেষভাবে লাভবান হয়। এই সকল রাজ্যে কৃষিপণ্যের উৎপাদন গড়ে বার্ষিক ৯% থেকে ১০% বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে অসম, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা ইত্যাদি রাজ্যে কৃষিপণ্যের উৎপাদন সর্বোচ্চ বৃদ্ধি পায়। ফলে কৃষি উন্নতির ক্ষেত্রে একটি আঞ্চলিক বৈষম্য সৃষ্টি হয়।

(৩) শ্রেণীগত বৈষম্য বৃদ্ধি: নতুন কৃষি কৌশলের দরুন আঞ্চলিক বৈষম্য ছাড়াও কৃষকদের মধ্যে আয় বৈষম্য বৃদ্ধি আরো সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নতুন কৃষি কৌশলের অন্তর্ভুক্ত উপাদান, যেমন উচ্চফলনশীল বীজ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক, সেচের সুযোগ প্রভৃতি সুবিধা কেবলমাত্র আর্থিক দিক দিয়ে সঙ্গতিসম্পন্ন কৃষকরাই গ্রহণে সক্ষম। ফলে গ্রামাঞ্চলে ধনী আরো ধনী হচ্ছে। কিন্তু দরিদ্র কৃষকদের পক্ষে এই ব্যয়বহুল প্রযুক্তি গ্রহণ করা সম্ভব হয় না, তাই তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই চিরাচরিত পদ্ধতি অনুসরণ করে চাষ-আবাদ করে থাকে। ফলে দরিদ্র কৃষকদের আর্থিক অবস্থা দিন দিন খারাপ হচ্ছে।

(৪) সবুজ বিপ্লবের অস্থায়িত্ব: ১৯৬০-এর দশকে ভারতের কৃষিক্ষেত্রে নতুন কৃষি কৌশল প্রবর্তনের ফলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও কৃষি উৎপাদনে অস্থিরতা রোধ করা যায়নি। ১৯৭৯-৮০ থেকে ১৯৮৯-৯০ সালের মধ্যে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির হার ৩.৫৪% থেকে কমে ১৯৮৯-৯০ থেকে ১৯৯৮-৯৯ সালে ১.৮০% হয়েছে।

(৫) নতুন কৃষি কৌশল ব্যবস্থায় কলকারখানার ধাঁচে উৎপাদন হওয়ায় কৃষিতে মূলধন বিনিয়োগের জন্য অনেকটা ধনতান্ত্রিক কৃষিব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন বৃত্তিধারী ব্যক্তি, যেমন— সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারী, সেনাবাহিনীর লোক, কৃষিকে শিল্প হিসাবে গ্রহণ করে বিনিয়োগ করতে সচেষ্ট। ফলে ক্ষুদ্র চাষীরা শ্রমিকে পরিণত হচ্ছে।

(৬) কৃষিতে উচ্চফলনশীল বীজ, রাসায়নিক সারের ব্যবহার উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করলেও অত্যধিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার কৃষি-শ্রমিকদের কৃষিকাজে নিয়োগের সম্ভাবনাকে অনেকাংশে হ্রাস করেছে।

(৭) নতুন কৃষি কৌশল গ্রামাঞ্চলে (ক) বড় ও ছোট চাষীর মধ্যে, (খ) মালিক ও ভাগচাষীর মধ্যে এবং (গ) মালিক ও কৃষিশ্রমিকদের মধ্যে নতুন বিরোধ সৃষ্টি করেছে; ফলে সামাজিক অশান্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিশেষে বলা যায়, ভারতীয় সবুজ বিপ্লবের পরিব্যাপ্ততা কিছু নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং মুষ্টিমেয় কিছু সম্পন্ন কৃষকের কুক্ষিগত। তাই কিছু পুঁজিবাদী কৃষকের কাছে এই নতুন কৃষি কৌশল যতখানি আকর্ষণীয় হয়েছে, দরিদ্র ও স্বল্প পুঁজিসম্পন্ন কৃষকের কাছে এই কৌশল দুর্দশার কারণ হয়েছে। ভারতে যে সবুজ বিপ্লব অর্থাৎ কৃষির অগ্রগতি আমরা লক্ষ্য করছি তা হল স্বল্পমেয়াদী অগ্রগতি। সামগ্রিকভাবে কৃষিপণ্যের উৎপাদনে দীর্ঘমেয়াদী অগ্রগতিই যদি সবুজ বিপ্লব হয় তবে ভারতে যা ঘটেছে তা কৃষির আংশিক উত্তোলন (Partial take off stage), সবুজ বিপ্লব নয়।

Eyes Feeling Pain

Sudarsana Sarkar
(Assistant Professor, Department of Economics)

Eyes feeling pain to see the true world
And what is the false world made up with?
Lots of black smoke and dust encircling it
People turned black is not a false myth.
Eyes feeling pain to see the true world
And what is the environment we are working with?
Made up of tough mental assignments and physique
People have forgetten to normally laugh and speak.
Eyes feeling pain to see the true world,
Emotions are rare only motions are with
To live in this artistic world in an artificial designed way
People though believe they are free to stay.
Eyes feeling pain to see the true world
And is this the climate we are living in?
Nor hot nor cold nor is it rainy to be seen
People has only thought how to materialistically win.

প্রত্যাবর্তন

শুদ্ধরাগ বিশ্বাস
(ফুড এণ্ড নিউট্রিশন, সেমিষ্টার-৩, রোল-৬৬২)

শিশির-পরশে দিবসরজনী যে মন্দাক্রান্তা
শ্লথ দিবা-উষ্ণতায় হেসে চলে নির্লজ্জ দ্বিপ্রহর
'silappadikaram' যতই শেখাক বিষাদ পন্থা
দিগন্তের প্রত্যাঘাতে আজ আমি আর নই তোর।

অমর ভাগ্য হয়তো নয়" ডুমুরের ফুলঁ"
সাইরেন-হেডেরাও নাকি প্রত্যয়ী'তে আমো'র
''বিশ্বাসে বস্তু পাইনি মিলিয়ে" বলা ভুল
পেয়েছি কঠিন বাস্তব, ভেঙেছি মায়াডোর।

ব্ল্যাক সাবাথ এর বুক চিরে আসে কনভয়
আগুনে কুয়াং-ডুক এর আত্মত্যাগ আজ অমর
দ্বিসহস্র দ্বাবিংশ ইমপ্লিমেন্ট-এ হোক জয়
প্রতিদিন হোক 'রেনেসাঁ-এ-অপরাজিত' ভোর।

সমালোচনা আদপেই কালচার-ভালচার
বাঁচার রসদ সেফিস্টোফিলিস-ফুতাকুচি ওন্না'র
কবিরা তবু লিখে চলে' auld lang syne'
বক্তব্য : এ যুগেও প্রত্যাবর্তন হোক 'ইশা মুসার'।

জ্যোৎস্না ধোঁয়া শহর

সোহম পাল
(মানব উন্নয়ন বিভাগ, প্রথম বর্ষ, রোল-৫৩৯)

জ্যোৎস্না ধোঁয়া শহর।
হাতছানি দেয় ছাতিম, দস্যিপনায় মত্ত।
শিউলি টুপটাপ মন ঝড়ায় রাস্তায়।
আজ রাত সৃষ্টিছাড়া,
স্বপন্ আঁকে আমারি মতন,
রাত জাগে রাতের কোলে, জ্যোৎস্না পোড়ায় মন।
তবু বেঁচে থাকে প্রেম!
কাঁচ ভাঙা আয়নায়...।।

ইচ্ছা

শর্মিষ্ঠা সামন্ত
(Food & Nutrition (Hons), 1st Semester, Roll-638)

আমার ইচ্ছা—
হবোই আমি ডায়টিশিয়ান।।
পড়াশোনাতে মন বসে না
তবু হবোই আমি ডায়টিশিয়ান।।
প্যাকটিক্যালে ভালো লাগে না
তবু হবোই আমি ডায়টিশিয়ান।।
নিউট্রিশনে বড্ড কাঁচা
তবু হবোই আমি ডায়টিশিয়ান।।
সারাদিন থাকি ফোনের মধ্যে
তবু হবোই আমি ডায়টিশিয়ান।।
ইচ্ছাশক্তির জোরেই
হবোই আমি ডায়টিশিয়ান।।

তোমায়

সুস্মিতা দাস
(বি.এ. জেনারেল, সেমিস্টার-১, রোল-৯০৫)

সেদিন রাস্তাটা ছিল একটু বেশি ব্যস্ত
আমি বেরোলাম একটু ভিড়ে
তোমায় দেখলাম আলতো করে
মনটা কেমন ব্যাকুল হলো
দেখতে চায় আবার তোমায়
দিনটা কাটে তোমায় ভেবে
আঁধার রাতে আমি জেগে
ঠিক করে নিই বলবো তোমায়
মনটা কেমন না না করে
তুবও তো একটা ভয়
ওই মানুষটা যদি অন্যের হয়
সাহস করে ডাক দিয়েই দিলাম
দেখাই যাক কি আর হবে
ডাক তো আমি দিয়েই দিলাম
সে আলোতে হঠাৎ যেন
নিরব আমার মুখটা হলো
হঠাৎ সে আমায় বলে
ভাবছোটা কি বলো কিছু
বলেই দিলাম মনের কথা
ভালোবাসি আমি তোমায়
একছুটে পালিয়ে গেলাম
সকাল পেরিয়ে বিকেল হলো
ওই যে মানুষটা দাঁড়িয়ে আছে
অবাক চোখে গিয়ে বলি
এখানে কি করছো তুমি
সে যা বলে শুনে আমি
এক পলকে হারিয়ে গেলাম
হুস ফিরিয়ে সে আমায়
বললো আমিও তোমায় ভালোবাসি
পরিচয় থেকে শুরু
শেষ প্রয়াত কালেই
ভালোবাসি কথাটা বলা
সারাজীবন একসাথে চলা
সব হলো প্রতিশ্রুতি বদ্ধ
আমাদের ভালোবাসায় ছিল
রাগ, অভিমান, খুনসুটি, কষ্ট
কিন্তু ভালোবাসাটা ছিল
সবচেয়ে বেশি আর পবিত্র।

নতুন বছর

গায়েত্রি নায়েক
(বি. এ. জেনারেল, সেমিষ্টার-১, রোল-৯৩১)

নুতন বছর ফিরে আসে
পুরাতনের পরে
বৃক্ষ যেমন পাতা ঝরায়
নতুন পাতার তরে।
না-পাওয়া সব ভুলে গিয়ে
নতুন কিছু ভাবো।
আশায় আছি সবার কাছে
ভালোবাসা পাবো।
হাসি খুশি থাকবো মোরা
মিলে সবার সাথে,
নতুন বছর এগিয়ে দেবে
অগ্রগতির পথে।।

চিন্ময়ী মা

অনিকেত কুমার দত্ত
(ইতিহাস বিভাগ, সেমিষ্টার-৫, রোল-৪৮৭)

ভেঙে পড়ে আছি মৃন্ময়ী মা,
লণ্ডভণ্ড মণ্ডপ মাঝে...
লাঞ্ছিতা আজকে চীন্ময়ী মা,
অসুরেরা আসে যুদ্ধ সাজে...
বঙ্গদেশ, এই কী তোমার!
মায়ার ভরানো ছাঁয়ার আচল?
তোমার বুকে রক্ত ঝরেছে,
ঝরেছে আরো চোখের জল।
রক্তে ভেসেছে ইস্কন মঠ,
মানুষরুপী দানবের হাতে...
বঙ্গদেশে ঘনায় ঘনায় যে মেঘ
তোমারো শারদ প্রাতে।

রক্তিম ৭১

অনিকেত কুমার দত্ত
(ইতিহাস বিভাগ, সেমিষ্টার-৫, রোল-৪৮৭)

ভাইয়ের রক্ত ঝরেছিল সেদিন,
একাত্তরের সংগ্রামে
ভাইয়ের রক্ত আজও ঝরে,
ধর্ম নামক আফিমের নামে
সেদিন পাপি পাকিস্তানিরা,
করেছিল দেশ ছারখার—
পাপিরা গেছে, আছে পড়ে শুধু,
পাপির বংশ রাজাকার।

জন্মদিনের প্রাক্কালে

অনিকেত সাহা
(বি. কম সাধারণ, সেমিষ্টার-৩, রোল-৫৩)

স্বাধীনতার ঝান্ডা হাতে
এসে দাঁড়াই রোদ্দুর ক্যানভাসে
ধুলো ঝড়ে মেঘ ছিঁড়ে ছিঁড়ে
তছনছ স্পর্ধিত সর্বনাশে।
তবু হাল ছাড়িনি বন্ধু,
শক্ত হাতে রোদ্দুর ভেঙে ভেঙে গড়েছি পাহাড়
একলা ভিজে ভিজে খালিপাত্র ভরেছি লগাতার।
আজও ঘুমহীন সাগরের চিৎকারে
মাঝ রাতে ঘুম ভেঙে যায়—
অন্ধকার একা কঙ্কাল রাতে,
বাদুর চিন্তারা ডানা ঝাপটায়।
তবু ভোরের আলো মেঘে বরণডালা সাজে,
শুরু হয় নতুন অধিবেশন;
জীবন সে তো বেদুইনের তেজি ঘোড়ার
লাগাতার আন্দোলন।
পার হয়ে গেছি অনেক গোবী, সাহারা
পার হয়েছি আটাকাশ
জীবন প্রশান্ত মহাসাগর পার হতে হবে
যতক্ষণ বাজে দামামা...।

ভুল

সোনি সিং
(ভূগোল অনার্স, সেমিষ্টার-৩, রোল-৫৭৫)

কোনো মানুষই Perfect হয় না, আমরা সবাই ভুল করি।
কিন্তু সবার মধ্যে ভুলটা বুঝে সংশোধন করে
নেওয়ার প্রবণতা দেখা যায় না।
বর্তমানের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে নিজেদের অতীতের দিকে
ফিরে তাকানোটা সহজ হয় না।
কিন্তু ভুলগুলো এভাবে সহজেই বোঝা যায়
এবং নিজের ইচ্ছা থাকলে সেইটা শুধরেও নেওয়া যায়।
আর সেটাই উচিৎ।

আসলে নিজেদের ভুলগুলো স্বীকার করতে
অল্প ধৈর্য্য আর নমনীয়তা ছাড়া তেমন কিছুই লাগে না।
কিন্তু, চারিত্রিক স্বচ্ছতাটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই Option মাত্র mandatory নয়।

অভিযান

বাস্তব বিশ্বাস
(ভূগোল অনার্স, সেমিষ্টার-১, রোল-৫৮১)

উল্টো সবই দেখছি আজই,
চতুর লোকের কারসাজি;
উল্টো শাস্তি, উল্টো আঘাত,
তাইতো ঘটছে এত ব্যাঘাত।
মিথ্যে যারা বলছে আজ,
করছে নাকো একটু কাজ।
লুটছে তারা ঝুড়ি ঝুড়ি
মারছে কাটছে, করছে চুরি।
বলছে যারা সত্যি কথা
তাদের সইতে হচ্ছে আরও ব্যাথা।

দিনরাত্রি খাটছে যারা,
হচ্ছে তারাই দিশেহারা।
একমুঠো আজ ভাতের তরে,
হাহাকার আজ ঘরে ঘরে।
চেঁচিয়ে লাভ নেইকো আর
মোদের কান্না শুনবে কে আর!
তার চেয়ে ভাই মিলিয়ে হাত,
করবো আমরা বাজিমাত।
ভাগ্যকাশের অস্তরবি
উঠবে আবার বলছে কবি।

If A Krishna Could Be a Lion

Nisha Shaw
[Commerce (Honours), Semester-5, Roll-154]

If a Krishna could be a lion in the zoo,
Walking up and down, the way they do...
With strippen skin and eyes of green...
He would pretend to be so dangerous & mean...
    That nobody even dare...
    to clean my cage...

He would growl in a scary manner,
Till all agreed, with worried faces...
That he really comes from other places...
he would smile and wink at the people there.
    And trot along home...
    to his jungle lair...

An Innocent Dawn

Rahul Banerjee
[Economics (Honours), Semester-1, Roll-719]

Sun starts to shine, darkness beging to fide,
Everthing is becoming quite easier to find,
The jungle seems to lurk in the dark shade,
Leaving it's softness and beauty behind.

A pond; not so large; when meets the sun,
A glittering ambience is what one feels.
The deeper one looks; the bigger is the fun,
Whilst abserving everything from the golden hills.

Birds start to chirp and a soft breeze flows
Dew drops on grasses lights up the way;
Everything seems to thank the sun for being so close,
And that's how the world starts a new day.

Ends a day when falls the night
Giving us a message to continue the fight.

A Brittle Hope

Manisha Karmakar
(English Department, Semester-5, Roll-336)

Barren city, wandering alone.
Hidden by the mountain tops.

An isolated traveler,
With a debt that has not been paid.

Looking for these perpetual lands,
For the love that walked away.

Not very often but it happens occasionally,
We have to let go of beautiful things.

A brittle hope that remains alive,
For the waiting, the yearning.

Words to speak

Biswajit Nath
[Economics, Semester-III, Roll-718]

Words are there that I want to speak
Eyes are there that want to blink
Oh! God, the universal power
Rise in my hearts like potential fire.
Word are there I want to speak
Success must come as individual need
Oh! God, the universal power
Drain from me the unending failure.
Words are there I want to speak
Targets must be fulfilled and reached
Oh! God, the universal power
Open the gates of mental desire.
Words are there I want to speak
Barriers are there of imaginary brick
Oh! God, the universal power
Hold in my heart the confidence tower.

SOME OF OUR COLLEGE ACTIVITIES

Seminar on Carrier Guidance and Capacity Building by TCS

Cultural Programme - 75th Independence Day Celebration

Debate Compitition

SOME OF OUR COLLEGE ACTIVITIES

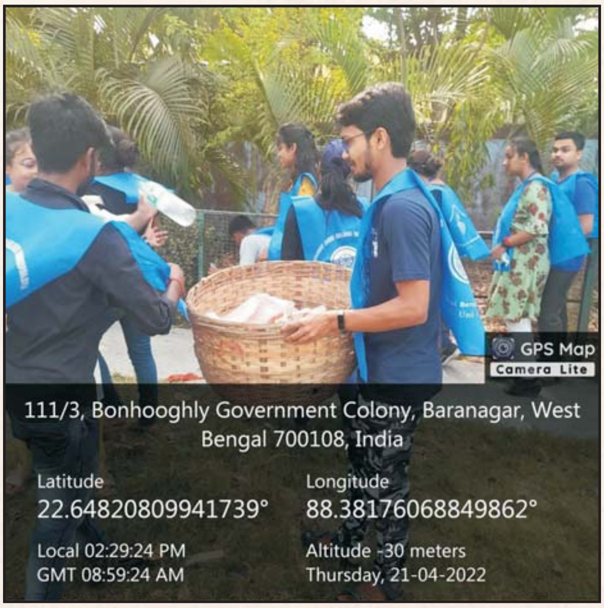

Drive for Plastic Free Campus

Free Legal Right Service of Citizens Awareness Programme

Alumni programme organised by Bengali Department

SOME OF OUR COLLEGE ACTIVITIES

Lecture of Human Right Day

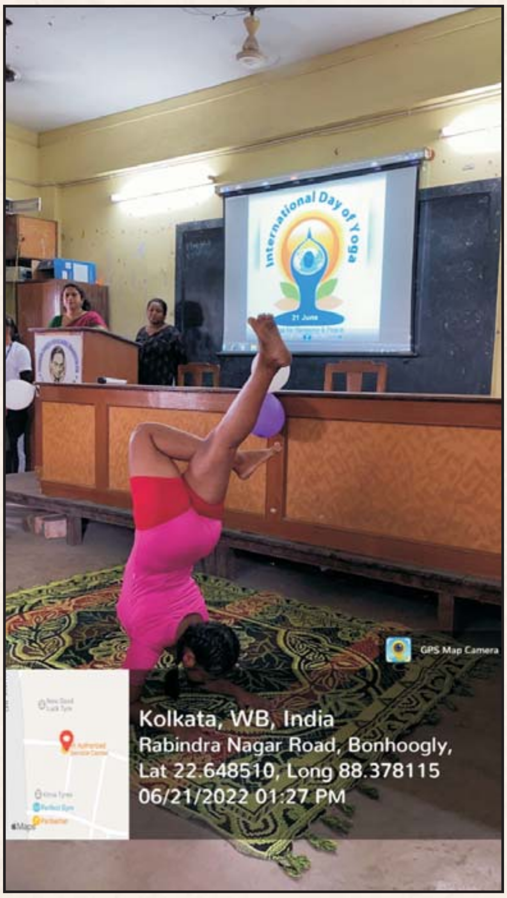

International Yoga Day Celebration 2022

Celebration of Birthday of Swami Vivekananda 2023

SOME OF OUR COLLEGE ACTIVITIES

Special Lecture on Felling of Tax Return
by Commerce Department

Entrepreneurship Development Programme organised by MSME

World Diabetics Day Celebration 2022
by Food & Nutrition Department

SOME OF OUR COLLEGE ACTIVITIES

World AIDS Day Celebration

Extension activity at Adyapith for observance of NSS foundation day

Annual Sports December 2022

Gender Equity Cell Workshop on Gender Bias and Stereotype

SOME OF OUR COLLEGE ACTIVITIES

Green Initiatives

World Ozone Day Celebration

National Education Day Celebration

SOME OF OUR COLLEGE ACTIVITIES

Value Education Programme

152nd Birth Anniversary Celebration of Mahatma Gandhi

Kabaddi Match 2016

SOME OF OUR COLLEGE ACTIVITIES

College Social

Skilled Development Programme

Health Check-up Camp 2019

SOME OF OUR COLLEGE ACTIVITIES

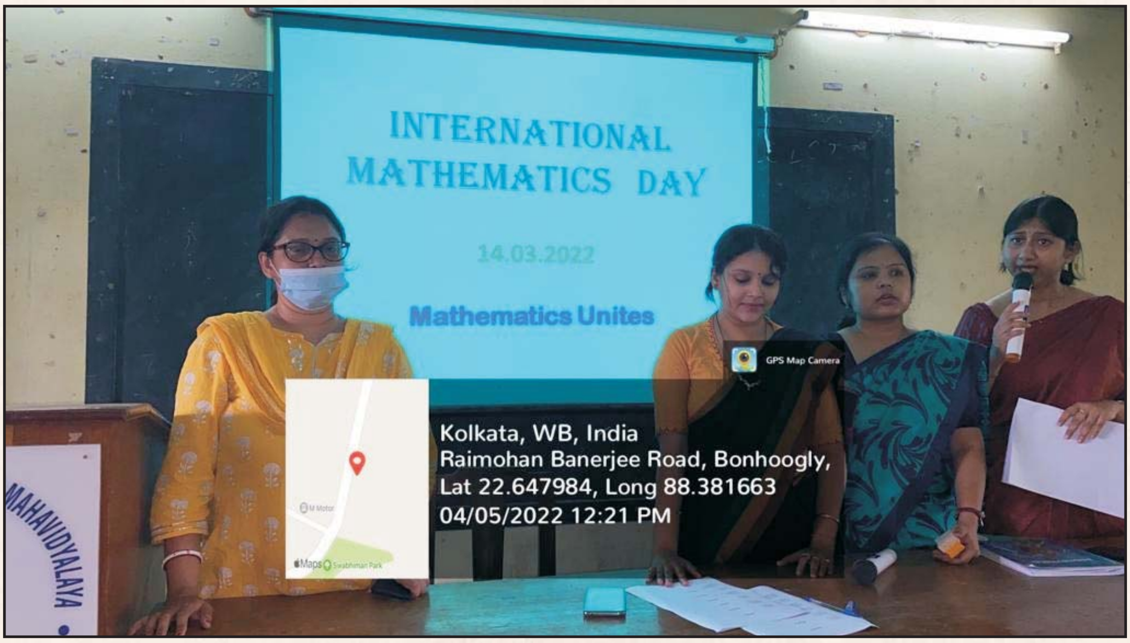

National Mathematics Day Celebration

21st February 2022 Celebration

SOME OF OUR COLLEGE ACTIVITIES

Blood Donation Camp

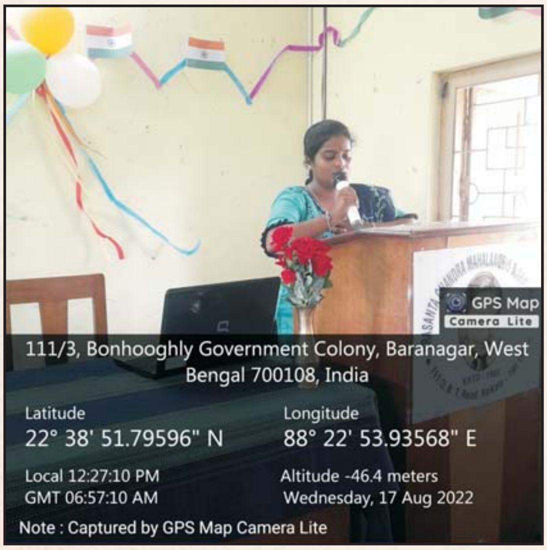

Student Seminar 2022

Celebration of World Coconut Day

Old Age Home visit organised by NSS

SOME OF OUR COLLEGE ACTIVITIES

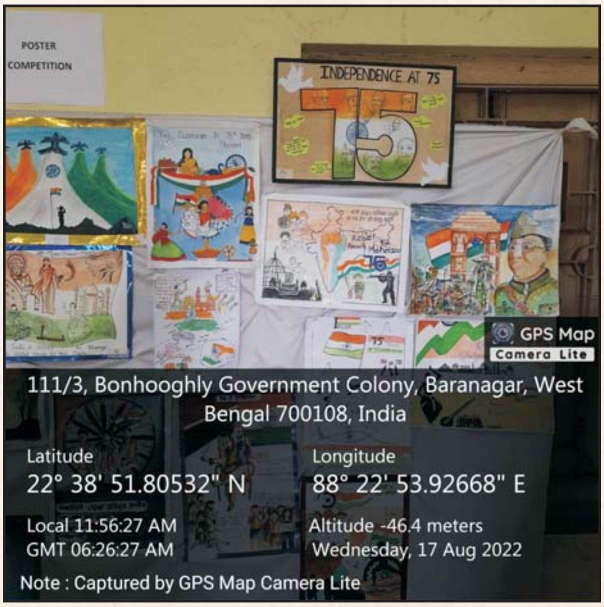

Poster Competition 2022

World Earth Day

Seminar 75th Independence Day Celebration

SOME OF OUR COLLEGE ACTIVITIES

Bhasa Divas 2023

Bosonto Utsav 2023

Campus Clearing 2023

সুমনা বৈরাগী (বি.কম. অনার্স, সেমিস্টার-৫, রোল-১৮৪)

রিক্তা ভট্টাচার্য (মানব বিকাশ বিভাগ, অনার্স, সেমিস্টার-১, রোল-৫৪০)

তনুশ্রী দাস (বি.কম. অনার্স, সেমিস্টার-৫, রোল-১৫৯)

বিবাস্বন ভট্টাচার্য (বি.কম. অনার্স, সেমিস্টার-৩, রোল-১৫১)

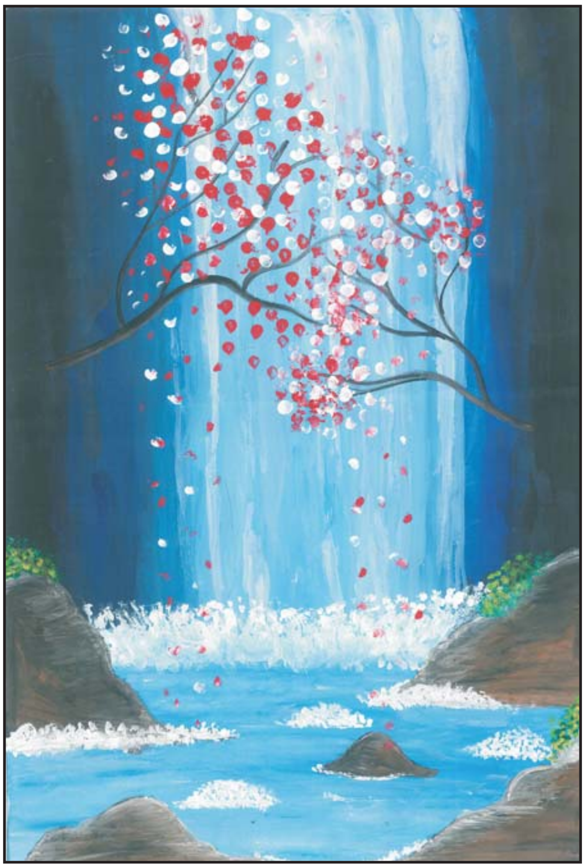

তৃষা বৈরাগী (ভূগোল অনার্স, সেমিস্টার-১, রোল-৫৮৩)

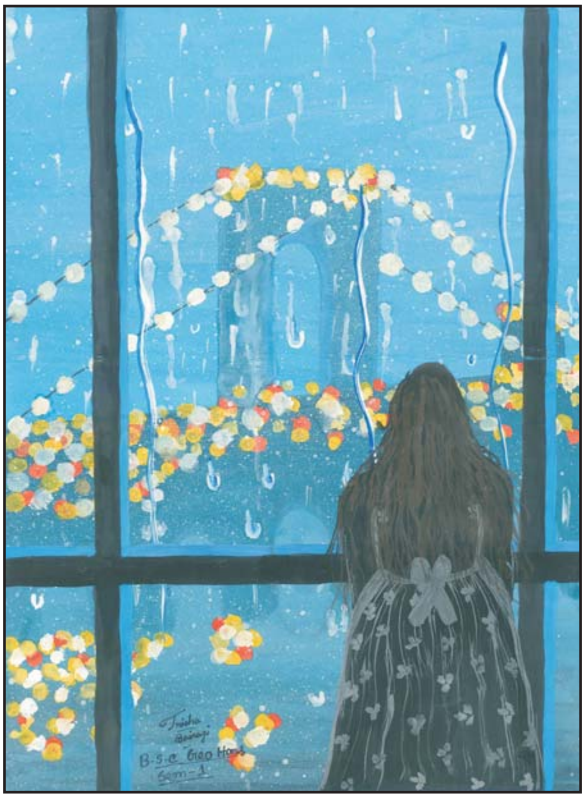

তৃষা বৈরাগী (ভূগোল অনার্স, সেমিস্টার-১, রোল-৫৮৩)

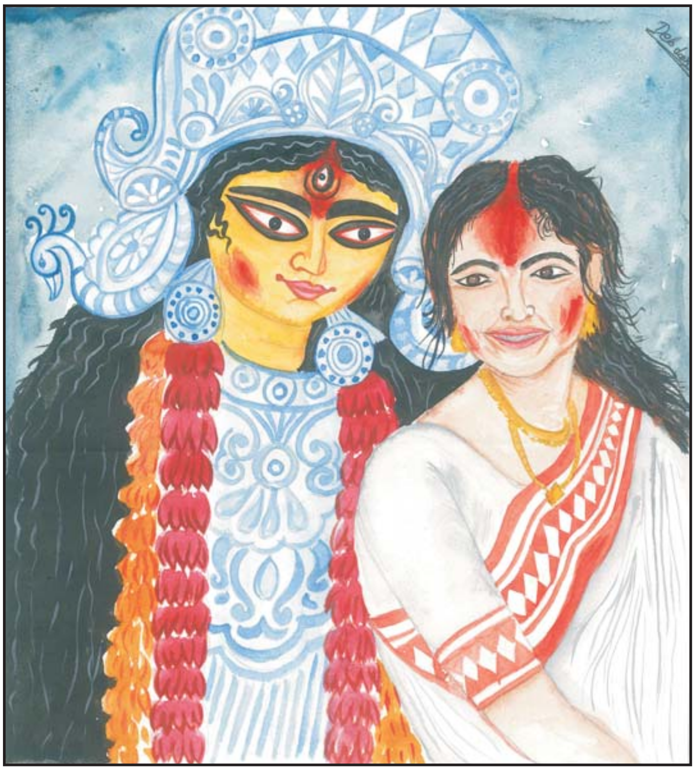

দেবদাস সর্দার (রাষ্ট্র বিজ্ঞান অনার্স, সেমিস্টার-৫, রোল-৫১৩)

হৃষিকা নন্দী (ফুড নিউট্রিশন বিভাগ, সেমিস্টার-৫, রোল-৬৬২)

সৃজিতা পাল (ইংরাজি অনার্স, সেমিস্টার-৩, রোল-৩৩২)

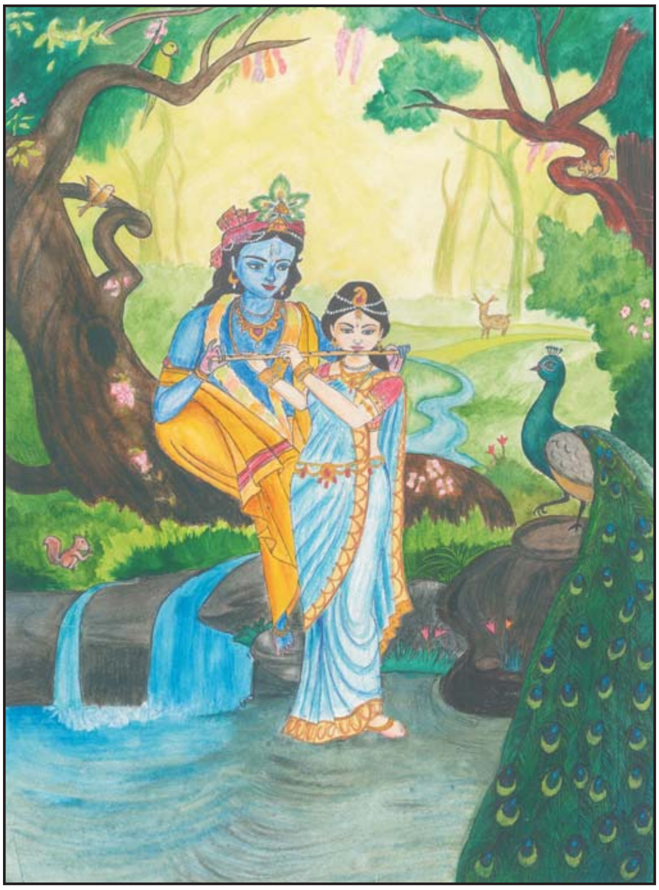
সৃজিতা পাল (ইংরাজি অনার্স, সেমিস্টার-৩, রোল-৩৩২)

সুমনা বৈরাগী (বি.কম. অনার্স, সেমিস্টার-৫, রোল-১৮৪)

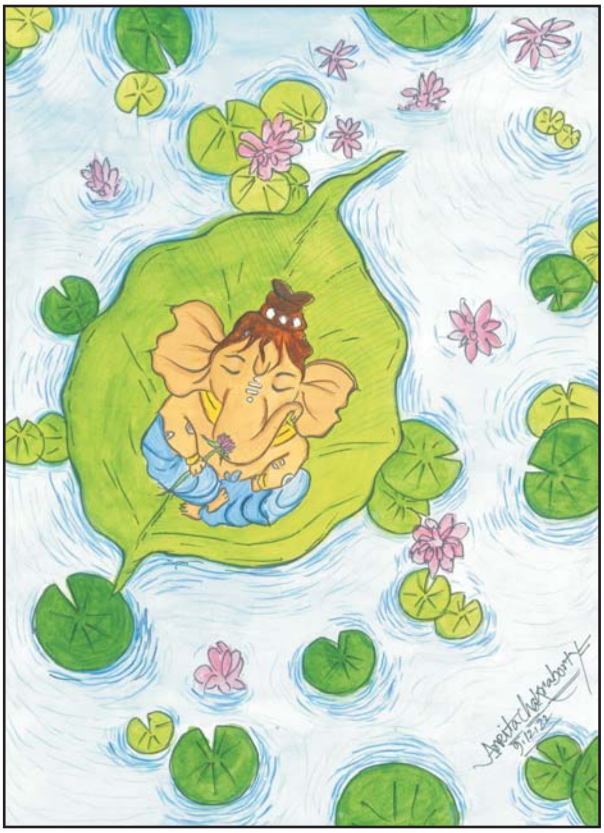

অর্পিতা চক্রবর্তী (ভূগোল বিভাগ, সেমিস্টার-১, রোল-৫৭৯)

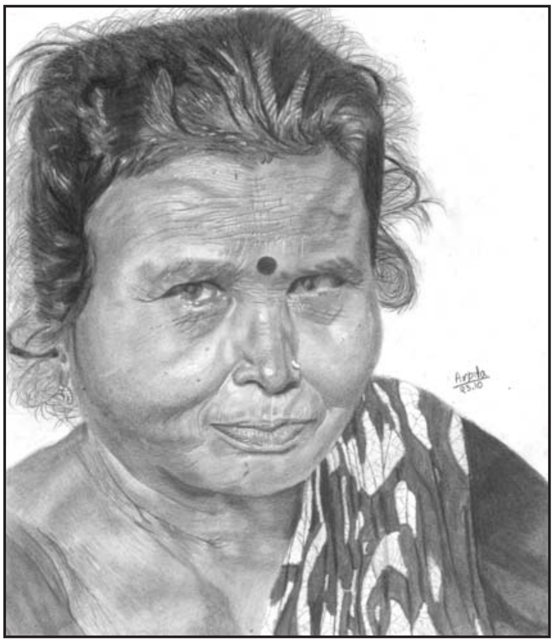

অর্পিতা দাস (বি.এস.সি জেনারেল, সেমিস্টার-৪, রোল-৮০৭)

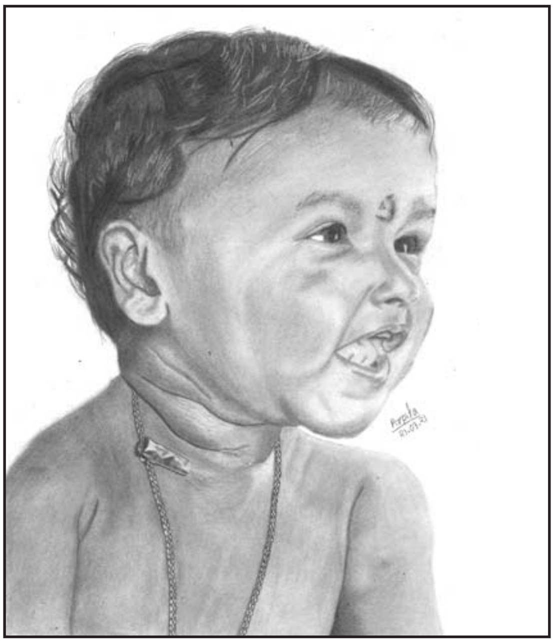

অর্পিতা দাস (বি.এস.সি জেনারেল, সেমিস্টার-৪, রোল-৮০৭)

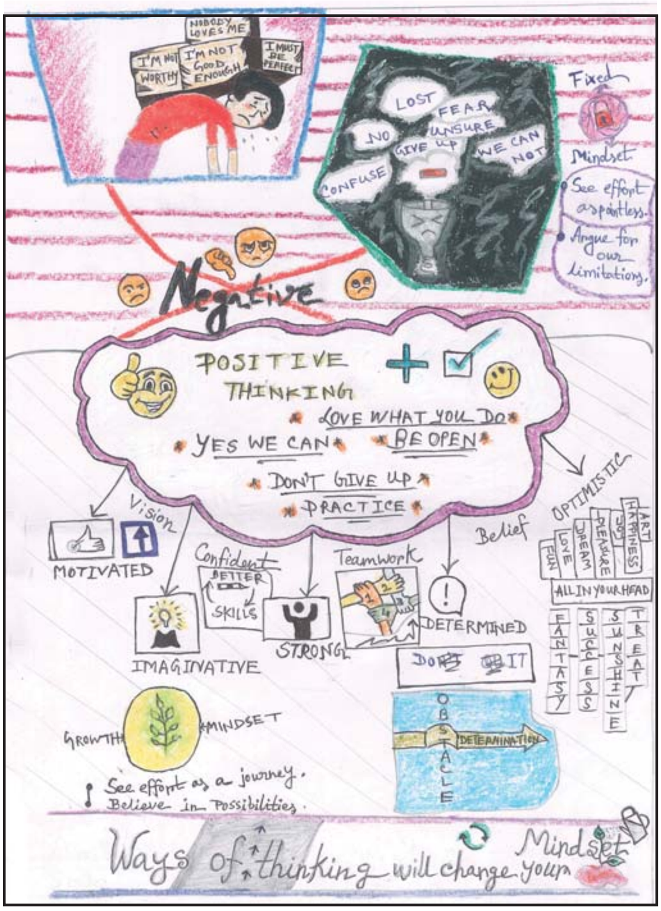

সৃজা ব্যানার্জী (বি.কম. অনার্স, সেমিস্টার-৫, রোল-১৫২)

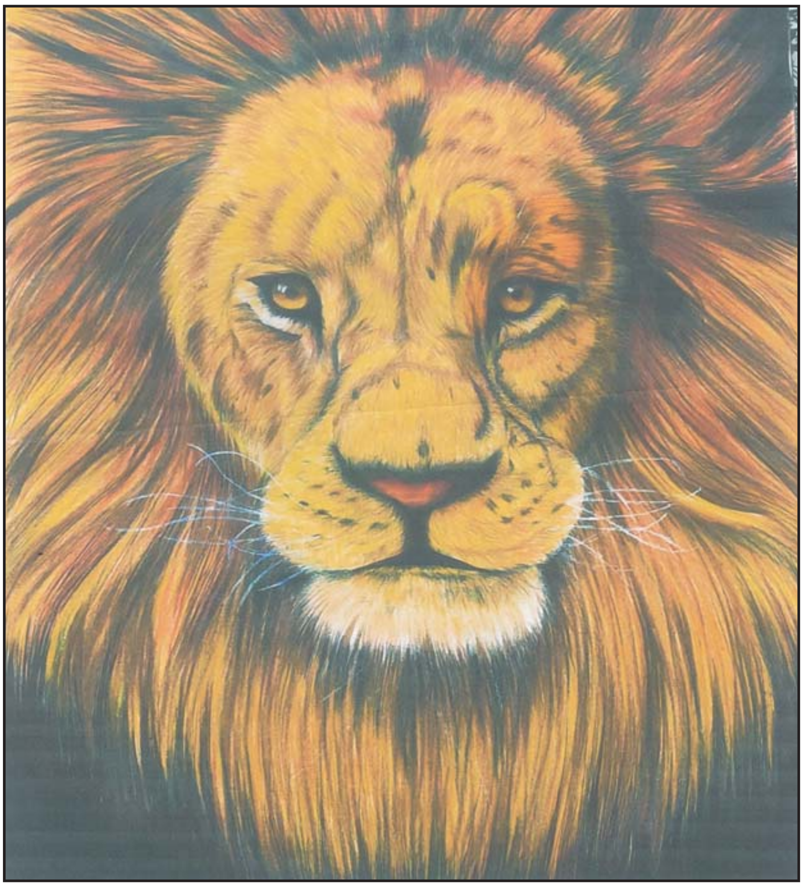

মনিষা কর্মকার (ইংরাজি অনার্স, সেমিস্টার-৫, রোল-৩৬৬)

ঈষা সর্দার (বি.এ. জেনারেল, সেমিস্টার-১, রোল-৮৮৮)

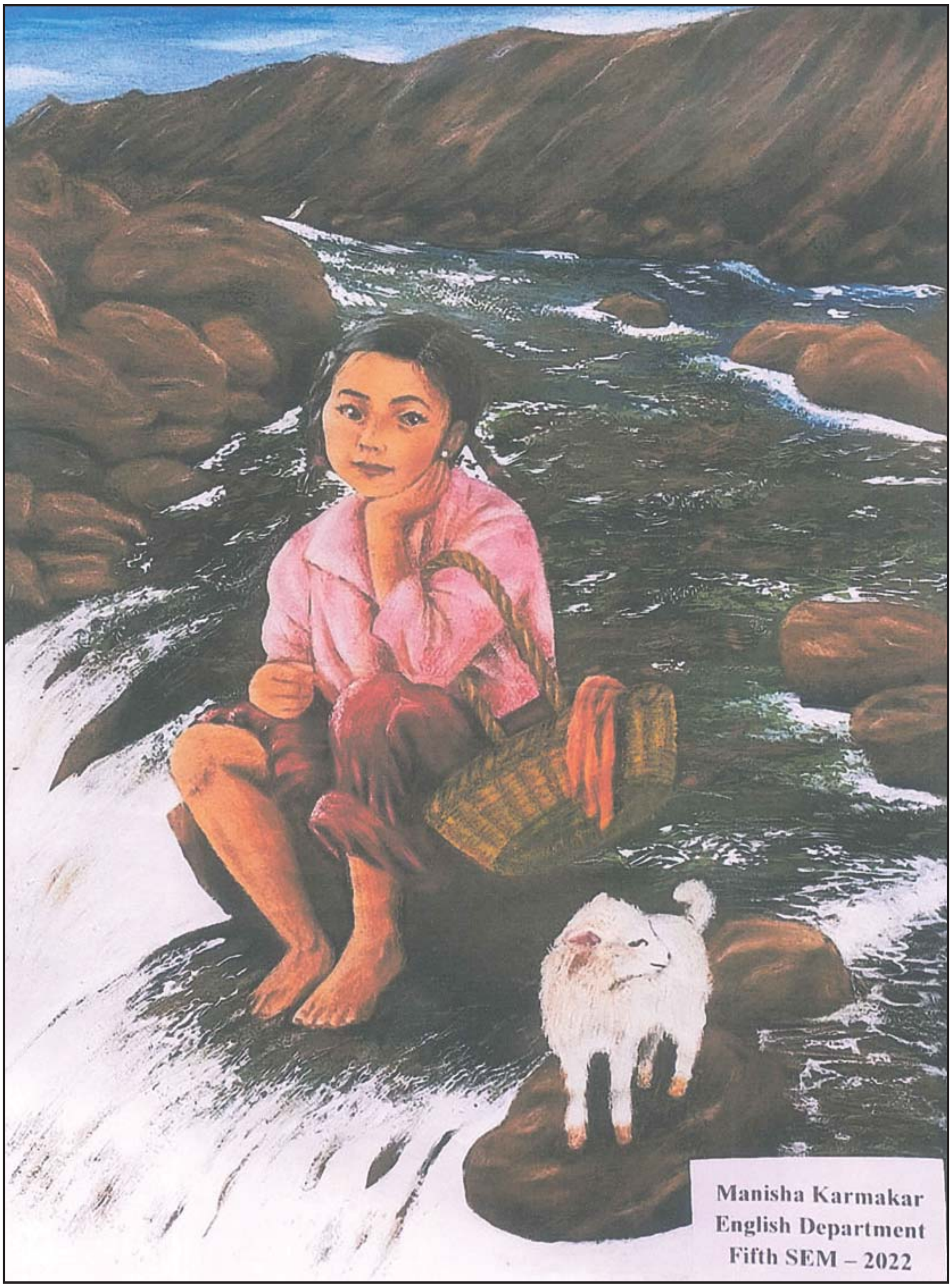

মনিষা কর্মকার (ইংরাজি অনার্স, সেমিস্টার-৫, রোল-৩৬৬)

UNMESH
ISBN NO. : 978-81-957244-4-4
Published by : Ratna Roy, Hornbill Books
Publishers address: 53/3 Jadav Ghosh Road (Ground Floor)
Sarsuna, Kolkata- 700061
Contact: 9883113034
email: hornbillboos2022@gmail.com
Printer : Modern Printer’s, Kolkata - 700090

ISBN NO.
9 788195 724444

HORNBILL BOOKS